কে দায়ী

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমরা পাচ বোন, এক ভাই। আমাদের সংসার, বিত্ত-বৈভব কম থাকলেও কখনো অভাব ছিল না। শুধু একটিই ইচ্ছা ছিল, তা হচ্ছে সুশিক্ষা অর্জন করে স্বাবলম্বী হওয়া। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে অনেক বন্ধু ও বড় ভাইয়ের প্রেমের অফার পেতাম।

যাই হোক। অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়তে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবা-মায়ের জেদে বিয়ে করি। স্বামী দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত কম্পানিতে চাকরি করে। বিয়ের দেড় বছরের মাথায় আমাদের একটি ছেলে হয়। ছেলের ছদ্ম নাম শুভ।

যখন শুভর বয়স ছয় বছর তখন আমার স্বামীর বদলির কাগজ আসে। ফলে আমাকেও স্বামীর কর্মস্থলে চট্টগ্রামে যেতে হয় স্বামীর সঙ্গে। আমরা চট্টগ্রামে যে বাসায় ভাড়া থাকতাম ওই বাসাওয়ালা হোটেলের ব্যবসা করতেন। তিনি আমাদের সজাতির লোক হাওয়াতে তাকে দাদা বলে ডাকতাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয়। আমিও দাদার সঙ্গে অনেক ফৃ হয়ে যাই।

আমার স্বামী কম্পানির কাজের জন্য মাসের বেশির ভাগ দিন বাইরে থাকতেন। এ জন্য সংসার ও শুভকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং আনা সব আমাকেই করতে হতো। শুভর স্কুলের যাতায়াতের পথে ওই দাদার আবাসিক হোটেলটি পড়ে।

দাদা আমাকে প্রায় তার হোটেলটি দেখে আসার জন্য অনুরোধ করতেন। কিন্তু আমি প্রয়োজন না হওয়াতে কখনো সেখানে যেতাম না। একদিন বর্ষার সময় বৃষ্টি আসায় ছেলেকে নিয়ে ওই দাদার হোটেলে আশ্রয় নিই। দাদা আমাকে দেখে মহা খুশি। তিনি তিন তলার একটি সাজানো গোছানো রুমে আমাকে বসতে দেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়াতে হোটেলের তেমন লোকজন তিন তলায় নেই।

একটু পর একজন কর্মচারী আমাকে চা ও কেক দিতে আসে। আমি সকালে নাশতা করায় কেক ফিরিয়ে দিই। কর্মচারীটি কেক নিয়ে শুভকে নিচে খেলার জন্য নিয়ে যায়।

জানালার পাশে সোফায় বসে বৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করছি আর চা খাচ্ছি। লক্ষ্য করি আমার চা পান শেষ না হতেই শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমি দাদা দাদা বলতে বলতে সোফায় অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আধঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরে দেখি আমার শরীরের কাপড় ঠিক নেই এবং আমি বুঝতে পারি ওই দাদা নামক নরপশুটি চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে আমার সম্ভ্রম হরণ করেছে।

তখন জোরে জোরে কাদতে থাকি। কিন্তু বৃষ্টির জন্য কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। নরপশুটি আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো। তার গালে চড় মেরে বৃষ্টির মধ্যেই সন্তানকে নিয়ে বাসায় ফিরি।

পরে ব্যাপারটি বার বার স্বামীকে বলতে গিয়েও বলতে পারিনি। কেননা আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। এছাড়া আমার তখনো আরো তিন বোনের বিয়ে বাকি। তাই ঠিক করি এ শহরে আর থাকবো না। স্বামীকে অন্য শহরে চাকরি বদলি করে নেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকি।

কিন্তু বিধি হলো বাম! ঠিক ওই ঘটনার সতেরো দিন পর নরপশুটি জোর করে আমার ফ্ল্যাটে আসে এবং আমাকে আমার শরীরের কিছু নগ্ন ছবি দেখায় যা দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। নরপশুটি বলে যায়, ছবিগুলোর নেগেটিভ যদি নিতে চাই তাহলে আজ সন্ধ্যায় যেন ওই আবাসিকে যাই।

সাত, পাচ না ভেবে শুভকে নিয়ে দ্রুত সন্ধ্যার পর নরপশুটির কাছে যাই এবং তার হাত পা ধরে, ধর্মের দোহাই দিয়ে নেগেটিভগুলো ফেরত চাই।

কিন্তু *চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী*। অবশেষে নরপশুটি আমাকে দাবার ঘুটির মতো ব্যবহার করার জন্য বলে, আমি যদি তার শর্তে রাজি হই তাহলে সে আমাকে সব রকম কলঙ্ক থেকে রক্ষা করবে এবং চট্টগ্রাম থেকে অন্য শহরে বদলি হয়ে আসার আগে আমাকে সব নেগেটিভ ও ছবি দিয়ে দেবে।

নরপশুটির শর্ত হচ্ছে, আমি যতোদিন চট্টগ্রাম আছি মাসে অন্তত একবার আমাকে ওই আবাসিক নামক নরকে বিদেশি পর্যটকদের এন্টারটেইন করতে হবে।

বুঝতে পারি এতে যেমন সে প্রচুর টাকা পাবে তেমনি আমাকেও কেউ চিনতে পারবে না। তাছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল, দুই তিন মাসের মধ্যেই আমরা অন্য শহরে বদলি হতে পরবো। নিরুপায় হয়ে ওই পাষাণ নরপশুর শর্তে রাজি হই। অতঃপর সেই সন্ধ্যাতেই এক রাশভারী মহিলা আমাকে হালকা মেকআপ দিয়ে জোর করে এক কানাডিয়ানের রুমে নিয়ে যায় এবং আমার লজ্জা মাখা শরীর থেকে শুধু অন্তর্বাস রেখে সমস্ত কাপড় খুলে নিয়ে দুই ঘণ্টার জন্য কানাডিয়ানের হাতে তুলে দেয়।

রাত দশটায় বাসায় আসার আগে নরপশুটি আমার ব্যাগে কয়েক হাজার টাকা গুজে দেয়। বাসায় ফিরে রাতে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেই আবার মনে মনে ভাবি, যা শেষ হবার তা তো দুজনের কাছে শেষ হয়েই গেছে, তাই সন্তানের করুণ চেহারা দেখে আর আত্মহত্যা করি না।

এরপর নরপশুটি আমাকে কয়েকটি বোরখা কিনে দেয় যা পরে ওই নরকে যেতাম।

আমি তৃতীয় তলায় অবস্থানের সময় শুভকে তারা নিচে খাবার, খেলনা দিয়ে আটকে রাখতো। কিছুদিন পর পর্যটন মৌসুম আসায় নরপশুটি আমাকে মাসে একদিনের বদলে চার পাচ দিন পর পর কল করতে থাকে এবং কোনো কোনো সময় স্বামীর অনুপস্থিতিতে দিনে ও রাতে দুই শিফট একাধিক বিদেশির সঙ্গে মিশতে বাধ্য করে। বিনিময়ে বোর্ডার প্রতি কয়েক হাজার টাকা গুজে দিতো।

লক্ষ্য করতাম, বেশির ভাগ বিদেশিরা আমার সাতাশ বছরের দীর্ঘাঙ্গিনী, সুঠাম ফর্শা শরীর, প্রশস্ত উচু বক্ষ ইত্যাদির জন্য প্রথম দর্শনেই *সেক্সি* বলে বুঝতে পারতো। এ কারণে তারা মাত্রাতিরিক্ত বড়ি খেতো শরীরে উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য। এরপর ব্লু ফ্লিম চালু করে ছবির মতো করে তারা আমার সঙ্গে সব কিছু করতে চাইতো। ফলে বাসায় ফিরে শরীরে অসহ্য ব্যথা অনুভব করতাম। কিন্তু কখনো স্বামীকে তা বুঝতে দিতাম না।

অবশেষে দীর্ঘ আট মাস পর আমার স্বামীর অন্য শহরে বদলির কাগজ আসে। চট্টগ্রাম থেকে আসার আগে নরপশুটি তার সব কথা রক্ষা করে। আমাকে মুক্ত করে দেয়। এরপর আমি এই নতুন শহরে এসে স্বপ্নের সোনার সংসার গড়তে গিয়ে দেখি আমার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে অর্থাৎ একটুতেই খুব অসুস্থ হয়ে যাই। তাই ডাক্তারের শরণাপন্ন হই।

ডাক্তার আমার বিভিন্ন পরীক্ষা করে জানায়, এই স্বপ্নে ভরা বিচিত্র মায়াময় বসুন্ধরায় আর আমি বেশিদিন থাকতে পারবো না অর্থাৎ আমি এইচআইভি পজিটিভে আক্রান্ত।

এখন আমার মনের মণিকোঠায় প্রতিটি মুহূর্তে একটিই প্রশ্ন ধ্বনিত হতে থাকে, তা হচ্ছে আমার মতো দুখিনীর জীবনে এমন করুণ পরিণতির জন্য কে দায়ী?

আমি! নাকি আমার নিয়তি!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

জগবন্ধুর চায়ের স্টল

- আ. হক

সে অনেক দিন আগের কথা। সম্ভবত ১৯৫৬–৫৭ সালের দিকে প্রথম চায়ের সঙ্গে পরিচয়। তখন বয়স আট–নয় বছর হবে। বাড়ির কাছেই সোহাগপুর হাট। তখনকার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বেলকুচি থানার এই হাট সুতা কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। হাটের উত্তর দিকের শেষ মাথায় গরুর হাট। ঠিক তার সঙ্গে লাগোয়া বিখ্যাত জগবন্ধুর চায়ের স্টল।

জগবন্ধু বাঙালি না, ইনডিয়ার বিহার অথবা অন্য কোনো প্রদেশের লোক। কোনকালে যে এই সোহাগপুর হাটে চায়ের ছোট্ট একটা স্টল দিয়েছিলেন তখনকার কেউ-ই সেটা বলতে পারতেন না। তখন সমস্ত বেলকুচি থানায় ওই একটাই চায়ের স্টল। এখানকার মতো যত্রতত্র চায়ের স্টল ছিল না। হাতে গোনা গুটিকতক লোক, সাধারণত উঠতি পয়সাওয়ালা এবং গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে চায়ের প্রতি নেশা ছিল। অল্প বয়সের ছেলেরা চায়ের স্টলে বসে চা খাবে এটা কল্পনাও করা যেতো না।

আমাদের বাড়ি হাটের নিকটবর্তী হওয়ায় প্রায়ই শীতের দিনে সকালে বাবা-কাকাদের হাত ধরে মাঝে মধ্যে ওই জগবন্ধুর চায়ের স্টলে চা খেতে যেতাম। বেলা উদয়ের মুহূর্তে ধোয়া ওঠা চায়ের ছোট্ট গ্লাসে চুমুকের স্বাদ এখনো যেন ঠোটে লেগে আছে। তখনকার দিনে চায়ের স্বাদও ছিল অনেক বেশি। এখন যেন মনে হয়, সে চায়ের এবং এখনকার চায়ের রাত-দিন পার্থক্য। তখন মানুষ চা খেতো খুব আয়েশের সঙ্গে, আস্তে আস্তে। দেখে মনে হতো চা ফুরিয়ে গেলে যেন স্বাদের মোহভঙ্গ হবে।

১৯৫৬-৫৭ সালের দিকে জগবন্ধুর চায়ের স্টলে যেদিন যেতাম, দেখতাম ওই সূর্য ওঠার সকালে স্থানীয় এবং হাট থেকে দুই তিন মাইল দূরবর্তী গ্রামের বেশ কয়েকজন নামি-দামি লোক যাদের বয়স তখন পচিশ ত্রিশ বছর তারাও রাতজাগা লাল চোখে অগোছালো লুঙ্গিটাকে এক হাতে ধরে অদূরে বসে চা খাচ্ছেন। কেননা তখন গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর বেশ কিছু লোক দোকানে বাশের মাচাইলে বসে আয়েশি ভঙ্গিতে গল্পগুজব এবং চা খেতো। তখন ওই আট নয় বছর বয়সের সময় বুঝতে পারতাম না এতো সকালে দুই তিন মাইল দূরের মানুষ শুধু কি জগবন্ধুর চায়ের আকর্ষণে আসতো, নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল! মুরুব্বিদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, এতো স্বাদের চা খেতেই কি এতো সকালে এতোদূর থেকে হেটে এসেছেন?

মুরুব্বিরা বলতেন, চা খেতে এসেছেন। তবে সকালে দুই তিন মাইল হেটে নয়, রাতে এখানেই ছিলেন।

আশ্চর্য হয়ে যেতাম, শুধু জগবন্ধুর চা খেতেই কি সারা রাত ওই লোকগুলো খোলা আকাশের নিচে বাশের মাচাইলে শুয়ে ছিলেন? তাদের চায়ের নেশার কথা শুনে আমারও যেন চায়ের নেশা আরো বেড়ে যেতো।

জগবন্ধুর স্টলে ওই সাত সকালে কিছু সদ্যস্নাত নারী পিতলের ছোট্ট ঘটি হাতে চা নিতে আসতো। ওই বয়সেই আমরা জানতাম এবং বুঝতাম সোহাগপুর হাটের পূর্বদিকের পুকুরের উত্তর পাড়ে যে বাড়িগুলো ওগুলোতে কারা বাস করে। আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে আমার জানা মতে একমাত্র তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকুমার বেলকুচির সোহাগপুর হাটেই পুকুর পাড়ের ওই পাড়াটা ছিল। কিছুটা বয়স হওয়ার পর বুঝলাম সাতসকালে ওই লোকগুলো দুই তিন মাইল হেটে শুধু জগবন্ধুর চায়ের লোভে সারা রাত মাচাইলে শুয়ে ছিল না, বরং সারা রাত ওই পাড়াতে ফুর্তির আমেজের সঙ্গে জগবন্ধুর চায়ের স্বাদের আমেজ এক করে শরীরের বাড়তি আমেজের চাঙ্গা ভাবটা সারা দিন ধরে রাখতেই ওনারা চা খেতেন।

জগবন্ধুর দোকানে যখনই যেতাম, দেখতাম খাটো, শাদা ধবধবে ধুতি, শাদা ফিনফিনে ফতুয়া, কাধে লাল চেকের গামছা, মাথার পাতলা শাদা চুলগুলো পরিপাটি করে আচড়ানো লোকটা ছিল ছোটখাটো। শরীরটা সব সময় তেল চকচকে দেখাতো। চা বানানোটাও ছিল তার শৈল্পিক। ছোট্ট গ্লাসে লিকারের সঙ্গে দুধ চিনি মিশিয়ে ছোট চায়ের চামচটা যখন নাড়তেন, মনে হতো যেন তন্ময় হয়ে কোনো শিল্পী এক মনে সুরের মায়াজাল সৃষ্টিতে মগ্ন।

ওই চায়ের স্টলটাই ছিল তার ঘর-বাড়ি, সব কিছু। কেননা সে বিবাহিত নাকি অবিবাহিত কেউ বলতে পারতো না। স্ত্রী এবং সংসার কোথায় বললে স্মিত হেসে পুকুর পাড়ের ওই পাড়ার দিকে আঙুল তুলে বিহারের *দেহাতি* ভাষায় বলতেন হুই-খানে। আজ এই বয়সে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতি রোমন্থনে জগবন্ধুর চায়ের স্বাদটাও যেন ফিরে আসতে চাইছে।

আজ সে সোহাগপুর হাট নেই। যমুনার করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে। সমস্ত বেলকুচিতে হয়তো হাজারটা চায়ের স্টল। হাজার হাজার কাপ চা বিক্রি হচ্ছে। শুনতে পাই, স্থানীয় লোকের ভাষায় *হাওয়া ভবন* নামে

খ্যাত চায়ের স্টলে দিনে ছয় সাতশ কাপ চা বিক্রি হয়। কিন্তু ওই জগবন্ধুর চায়ের স্টলের নজরকাড়া পরিচ্ছন্নতা, চায়ের মন মাতানো গন্ধ এবং পরিপাটি পরিবেশনা আজ আর কোথাও খুজে পাই না।

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ থেকে

দুষ্টামি

- সুজন

আমি তখন সবেমাত্র এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। বেকার। এতো সময় কি করে কাটাবো ভাবতে লাগলাম। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, টিউশনি করবো।

আমার এক বন্ধুকে বললাম একটা টিউশনি ঠিক করতে।

অবশেষে একটা টিউশনি হয়ে গেল। পড়াতাম ক্লাস এইটের এক ছাত্রকে এবং ক্লাস নাইনের এক ছাত্রীকে। মেয়েটির নাম তৃষা। ওর সবচেয়ে যেদিকটা আমার ভালো লাগতো তা হলো দুষ্টামি। সে ভারী দুষ্টামি করতো আমার সঙ্গে।

আমিও কম করতাম না। প্রথমদিকে সে দুষ্টামি করলেও চেহারা দেখা যেতো না তার। বলা দরকার, তাকে দেড় বছর পড়ালেও প্রায় নয় মাস তার মুখ দেখিনি।

পড়ালেখায় সে মোটামুটি ভালো ছিল বললে ভুল হবে না।

একদিন তাকে পড়াতে যাই, তারিখটা ঠিক মনে নেই। সেদিন পড়া শেষ করে বের হয়ে যাচ্ছি, এমন সময় রান্নাঘর থেকে মাসি, অর্থাৎ তৃষার মা আমাকে চা খেয়ে যাওয়ার জন্য ধরলেন।

ওনার আপত্তিটা উপেক্ষা করতে পারলাম না। ফলে আবার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

যেইমাত্র আমার ঘরে ঢোকা তখনই তৃষা বিভিন্ন কথাবার্তায় আমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়লো। যেমন আপনি কি আবার চা খেতে এসেছেন? পরে খেলেও তো চলতো। আপনি তো প্রতিদিনই আসছেন। কেমন ছেলে আপনি, শুধু এক কাপ চা খাওয়ার জন্য কতোদূর থেকে এসেছেন।

তার একটার পর একটা বাক্য আমাকে খুবই অস্বস্তিতে ফেলছিল।

এমন সময় মাসি তাকে ডাক দিলেন।

সে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রান্নাঘরে গেল।

মনে করেছিলাম চা নিয়ে আসবে।

দেখি কিছুক্ষণ পর সে খালি হাতে এসে আমাকে বলতে লাগলো, আপনি চলে যেতে পারেন। মা এমনি ফরমালিটিস মেইনটেন করার জন্য আপনাকে চা খেয়ে যেতে বলেছেন। আসলে ঘরে কিছুই নেই। চা–ও রেডি করেননি। বলামাত্রই যে আপনি ঘুরে বসবেন এ কথা মা ভাবেননি। এমনিতেই চা খেয়ে যেতে বলেছেন। মা বলেছেন কিছু মনে না করার জন্য।

খুব অপমান বোধ করতে লাগলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম টিউশনিটাতে পরদিন থেকে আর যাবো না। তখন একটু করে কৃত্রিম হেসে অপমান বোধটা কাটিয়ে বললাম, না না, একি, আমি তো ঘরের ছেলে, মনে করার কি আছে। পরে এসে দুই দুই কাপই খেয়ে যাবো।

তখনো জানতাম না এটা ছিল তার মিথ্যা নাটক।

যখন আমি চেয়ার থেকে উঠে দরজা পার হতে যাচ্ছি, তখন সে অট্টহাসি হেসে বললো, আমি জাস্ট দুষ্টামি করছিলাম।

আরো রেগে গেলাম।

সে খুব ভয় পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে যে দরজা দিয়ে আমি বের হবো সে দরজায় দাড়িয়ে দুই বাহু ছাড়িয়ে নিচু মুখে চুপ করে রইলো।
আমি আর কি করে বের হই!
পরক্ষণে সে বললো, আপনি তো জানেন আমি খুব দুষ্টু। এটাও আপনাকে নাচানোর জন্য দুষ্টামি করছিলাম। আপনি যে সত্যিই রেগে যাবেন ভাবিনি। সরি, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর করবো না কোনোদিন।
মাথা ঠাণ্ডা হলো।
সেদিনের কথা মনে হলে আমার সেই বোনটির কথা খুব মনে পড়ে। ইচ্ছা করে তাকে এখন গিয়ে দেখে আসি। আমি এখন চট্টগ্রাম কলেজে অনার্সে পড়ি। শুনেছি সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সে আমার খবর রাখে না। আমি মাঝে মধ্যে তাদের পাড়ার ছেলে বা বন্ধুদের দেখলে খুবই আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছে আমার বোনটি? কেমন চলছে তার লেখাপড়া? এ রকম হরেক প্রশ্ন।
তার জন্য খুব প্রাণ কাদে। কিন্তু কি করে অধিকার দেখাবো, সে যে আমার আপন বোন নয়। হয়তো আপন বোন হলে সেও আমার খবর নিতো। ভালো থাকুক আমার বোনটি।

চট্টগ্রাম কলেজ থেকে

স্ত্রীর পত্র

কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

কবিতাটি তোমার উদ্দেশে বহুবার বলেছি। শুনতে চাওনি কোনোদিন। আমিও বলিনি ব্যাখ্যা করে। আর শোনার মতো সময় বা মনই বা তোমার কোথায়! বন্ধু, ব্যবসা, নিজের জগৎ ছাড়া অন্যের দিকে নজর দেয়ার সময় কোথায় তোমার?
প্রথমদিকে তবুও বা যা নজর দিতে, পুষণ-এর জন্মের পর তোমার কাছে সেটুকুও ফুরালো। ব্যস্ত হলে তুমি আরো তোমার বাইরের জগতে। গুমরে মরতে লাগলাম। একলা ঘরে আমি। মধ্যরাতে কতো দিন বারান্দায় একাকী শুয়ে নিম গাছের পাতার ফাকে তোমার স্বপ্ন মাখা মুখ খুজে ব্যর্থ হয়ে আকাশের চাদ দেখেছি! শ্রাবণের বৃষ্টিতে কতোবার ভেজার সময় ডাক দিয়ে তোমার বিরক্তির কারণ হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না। আজ আর বোঝাতে চাইও না। থাক না ওসব কথা। একটা ব্যাপারেই তোমার কাছে আমার গুরুত্ব রয়ে গেল। তা হলো সকাল-সন্ধ্যা চা তৈরিতে, এই কাজটি বহু দুঃখে, বহু যত্নে শেষ পর্যন্ত বোধহয় ভালোই রপ্ত করেছিলাম। না হলে শত ব্যস্ততায় এই দুটো সময় তোমাকে পেতাম কি সে? আমার ভালোবাসায়? না! এ ভরসা এই জীবনে করি না।
কারণ ততোদিনে আর যাই হোক, এটুকু বুঝেছিলাম অন্য দশটা বাধা পথে চলা আমার হলো না। তুমি তো জানোই, আমাদের বাড়িতে চায়ের চল নেই। আমার বাবার চা পান বা কোনো কিছুরই নেশা ছিল না। তাই প্রথম তোমাদের বাড়িতে এসে যখন চা তৈরি করতে পারলাম না, সেদিনই তুমি বুঝলে তোমার পূর্ববর্তী বান্ধবীকে বিয়ে না করে কতো বড় ভুলই না তুমি করেছো। তাই ঢাকায় বেড়াতে নিয়েও সবার সামনেই বলতে, দেখো, এরাও চা বানায়, তুমি কিছুই জানো না।

লজ্জায়, অপমানে, গেয়ো, আনকালচার্ড আমি বার বার সুন্দর চা বানাতে গিয়ে যেদিন প্রথম শাড়িতে আগুন ধরালাম, এখন বুঝি সেদিন নিজের কপালেও আগুন ধরিয়েছিলাম। কারণ সেদিন থেকেই এক কিশোরী বৌ জেনেছিল তার দায়িত্বশীল পতির চা না খেয়ে মাথা যন্ত্রণা বাড়ার ও অন্য নারীর সংস্পর্শে তা কমার কথা।

যেদিন দেখলাম চায়ের সঙ্গে টা হিসেবে তোমার শালী তোমার কপাল থেকে সমগ্র শরীরটাও অধিগ্রহণ করেছে সেদিনই প্রথম বুঝলাম আমার খালাতো বোনের এতো ঘটা করে এ বাড়িতে আসা আর দুলাভাইকে পছন্দসই চা খাওয়ানোর রহস্য।

আমি অদ্ভুত রকম কাঠখোট্টা। না হলে ইচ্ছা করলে সেদিন ঠিকই চিৎকার করতে পারতাম, কাদতে পারতাম নিরন্তর। কিন্তু যেহেতু বিকেলের চা ছাড়া চলতে পারো না, তাই আমিই চলতে লাগলাম গা বাচিয়ে। রিতা আর তুমি, বড় সুন্দর মিললে যেমন চায়ের লিকার ঘন করতে মিলে যায় দুধ। পুষণ তার আনকালচার্ড মায়ের কাছে মানুষ হবে না বলে তাকে পাঠালে বোর্ডিং স্কুলে। পুষণের মাকেও পাঠানো দরকার। পুষণের মা বুঝে যোগ দিল ওয়ার্ল্ড ভিশনে, এ সকল খবরই তোমার জানা।

শুধু ষোল বছর ঘর করার পর আজও তোমার অজানা নিয়মিত অভ্যস্ত হওয়ার পরও হঠাৎ বহুদিন কেন নীলা চা খায় না? বহুবার প্রশ্ন করেছো, উত্তর করিনি। কিন্তু আজ এতো বছর পর যাযাদি দিল সেই হাতছানি। যার কথা এখন বলবো তোমাকে, তিনি প্রথমত আমার বন্ধু যিনি আমাকে সামাজিক করে তুলেছিলেন। দ্বিতীয়ত. তিনি আমার বস। তোমার মনে আছে কি না জানি না, এক ডিসেম্বরে আমরা কক্সবাজার গেলাম ওয়ার্ল্ড ভিশনের একটা কাজে। তুমি তখন ভীষণ ব্যস্ত, যেতে পারোনি।

দলের সঙ্গে কাজ আর সন্ধ্যার পর বিচে কুটু–র সঙ্গে গুলতানি করে বেশ কাটছে সময়টুকু। হ্যা এ নামটাতেই তাকে ডাকবো আমি। তার আসল নাম ঠিকানা তোমার জানার প্রয়োজনও নেই। যাহোক, যেদিন চলে আসবো তার আগের দিন রাত বোধহয় এগারোটা। রুমের ব্যালকনিতে বসে আছি একা। সামনে সাগরের বিস্তৃত জলরাশি চোখের জলকে কোনোভাবেই বাধ মানাতে পারছে না। বার বারই মনে হচ্ছে, মিথ্যা ফাকি ভরা এই জীবনে কি পেলাম? কেউ নেই। পুষণ, তুমি সব বিহীন এ জীবন।

আমার হাতে চায়ের মগ ঠাণ্ডা হতে চললো। কুয়াশায় অস্পষ্ট ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় হঠাৎ দেখি কুটু আসছেন আমার দরজায়। নীলাআপা দরজা বন্ধ করেন বলে ফিরতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাড়ালেন, ব্যাপার কি নীলা?

বললাম, না, কিছুই না। ঘুম আসছে না তো তাই।

তিনি বললেন, আমারও একই ব্যাপার, আচ্ছা, আসেন এক কাপ চা খাই।

বললাম, আপনি বসেন, আমি দিচ্ছি। যদিও জানি তিনি চা খান না তবুও দিলাম।

ওনার হিম হাতে অনেকক্ষণ পার হলো, দুজনেই বসে আছি, কারো মুখেই কথা নেই। হঠাৎ কুটু বললেন, নীলা, পুষণকে জানি ভীষণ মনে পড়ছে আপনার, মন খারাপ করবেন না।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেমন করে জানলেন আপনি?

একবার হাসলেন কুটু। তারপর বললেন,জ্ঞানত আমি কোনোদিনও কারো কোনো ক্ষতি করিনি। কিন্তু আপনি আমার যে ক্ষতি করেছেন তার মাধ্যমেই আপনাকে জানি।

চমকে উঠলাম। কারণ পাচটা বছর তোমার অবহেলা থেকে কুটুর কাছে কাজ করতে এসে আমিও তাকে বড় কম ভালোবাসিনি। সুন্দর, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কুটুকে সবাই ভালোবাসতো। কোনোদিন তাকে মিথ্যাচারও করতে দেখিনি। তাই বিশ্বাস নিয়েই দেখলাম সাগরের দিকে চেয়ে আছেন দৃঢ় আত্মসংযমী কুটু। বলতে দ্বিধা নেই, আমার সর্বস্ব চাইলেও আমার তখন দিতে দ্বিধা নেই। রুমেও কেউ নেই। কুটু নিষ্পলক আমার দিকে। আনন্দ, শিহরে আমি দিশাহারা। এতোদিন জেনেছি আমার কোনো দামই নেই। আজ দেখছি তার মুগ্ধতার সীমা নেই।

রাত বাড়ছে, আমরা চুপচাপ। হঠাৎ তিনি বললেন, আমি একটিবার আদর করবো তোমাকে। বন্ধ চোখে থরো থরো বসে আছি। হঠাৎ তিনি আমার হাতটা টেনে নিয়ে চুমুক দিলেন চায়ের কাপে।

তারপর দেখি কুটু নেই।

চলে গেছেন।

আজ বহু বছর পার হলো, স্মৃতির মণিকোঠায় আজও তিনি উজ্জ্বল। চাকরি ছাড়ার আগে যেমন বলেছিলেন, তোমাকে ভালোবাসার মতো সুন্দর কোনো সত্যি নেই। তোমাকে ছোয়ার মতো তৃপ্তি নেই। কবিতা ছুলেই যেমন আমি তোমাকে ছুই তেমনি চায়ের কাপে ঠোট ছোয়ালেই তোমার ঠোটের স্পর্শ পাই।

প্রিয়তম স্বামী, আমার একদিন তিন কলেমার জোরে অনেক কিছুই তুমি পেয়েছিলে সত্যি। কিন্তু বৃটেনবাসী কুটু পেয়ে গেল এ জীবনের সকল কিছু শুধু চায়ের কারণেই। তোমার কাছে আজীবন তোমাকে দিয়ে গেল তার দায়িত্বশীল মহানুভবতা থেকেই। আর তোমার নীলা চা খায় না যেহেতু কুটু খেতো না শুধু এ জন্যেই।

জানি তুমি ভালো থাকবে। তবুও বলছি, ভালো থেকো চা-কে নিয়ে। চায়ের চাওয়াকে নিয়ে, রিতাকে সঙ্গে নিয়ে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

রাতের পাহারায়

- মিল্টন রোজারিও

পাড়ায় ইদানীং চোরের উৎপাত বেড়ে গেছে। টেলিফোন, ডিশের তার যখন চুরি হয়েছিল তখন দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটে। বিরক্তির চরম সীমায় পাড়ার শান্তিপ্রিয় সুধী মানুষেরা। পরিকল্পনা শুরু হলো কি করা যায়? কল্পনাগুলো উচ্চাভিলাষী না করে বাস্তবমুখী করলেন রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক সারোয়ার জাহানবাবু। ইতিমধ্যে চোর ওয়ান টু মনে করে ইলেকট্রিক তার পর্যন্ত চুরি করলো নিজের মনে করে। পাঠক-পাঠিকা বুঝুন অবস্থাটা।

দেরি না করে দ্রুত আমরা র‍্যাব-পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি মাঠে নেমে পড়লাম। স্থানীয় রাজপাড়া থানায় বিষয়টি অবহিত করা হলো, আমরা রাতে পাহারা দেবো। শুধু যারা ডিউটি দেবে তাদের ছবি চাইলো থানা। আমরা সবাই প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নেমে পড়লাম। সবাই সবার মোবাইল, টেলিফোন নাম্বার জমা করলাম। চোর ধরা পড়লে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খবর দেয়া হবে।

আমার দায়িত্ব পড়লো দায়িত্ববান বাবুচাচার সঙ্গে। সবাই গ্রুপিং, লবিইং করে পালের গোদার সঙ্গে। আমি দূরে থাকতে চাইলাম। একে তো ফাকি মারা যাবে না, দ্বিতীয়ত. বাজে অভ্যাসের দরুন সামনে ধোয়া ছাড়তে পারবো না। অলটাইম যৌবনের অধিকারী চাচা বিষয়টা টের পেলেন।

সময় অনুযায়ী রাত দুইটায় ডাক পড়লো। জেগেই ছিলাম। টর্চলাইট, লাঠির সঙ্গে প্যাকেট, ম্যাচ নিয়ে বের হলাম যদি সুযোগ পাওয়া যায়। চাচা মাঝে মাঝে ফাকে দাড়িয়ে থাকেন। সুযোগ পেলেই *কোপা সামসু* ইটের ভাটা ধোয়া বরাবর।

চাচা প্রস্তাব দিলেন, আমি চা বানাচ্ছি, মোবাইলে মিসকল দিলে চলে আসবি।

আমি না করলেও চাচা মানবেন না।

তিনি চা বানিয়ে মিসকল দিলে অপর ইটের ভাটার মালিক শ্যামল গেলাম।

চাচা লাল চা বানিয়ে প্রস্তুত। সঙ্গে বিস্কিটের বোয়ম।

চমৎকার লাল চা খেলাম। মনে হলো চাচিও এমন চা বানাতে পারবেন না। যদিও চাচির হাতে চা খাইনি। আমার নজর ছিল বিস্কিটের বোয়মের ওপর। যা একটু ঘুম ধরেছিল তা কেটে গেল। পুরোপুরি ফ্রেশ হয়ে গেলাম।

আবার ডিউটি শুরু। ভোর পাচটা পর্যন্ত ডিউটি দিতে হবে।

কথা প্রসঙ্গে চাচা জানালেন সকালে তাকে পরীক্ষা নিতে হবে।

আমরা তাকে জোর করে ঘরে পাঠাতে পারলাম না আগে গিয়ে একটু বেশি বিশ্রাম পাবেন বলে। এর আগেও একজন কম ছিল বলে অন্য গ্রুপের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রতিউত্তরে জানালেন, আমি যদি ফাকি দিই তবে অন্য সবাইও ফাকি দিতে চাইবে। পরে অনেক বলে-কয়ে সাড়ে চারটায় ঘরে পাঠালাম।

প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার পিকনিক করার দিন ধার্য করা হলো। সেদিন পিকনিক করে রাত দেড়টায় পর নতুন গ্রুপে আমরা সব বন্ধুরা দায়িত্ব পেলাম।

খাওয়া শেষে বের হলাম চা-টার খোজে। পাড়ার মোড়ে দোকান খোলা না পেয়ে গ্রুপের তিনজন পাড়ায় রওনা হলো। আমি আর অপর বন্ধু কোর্ট স্টেশনের দিকে যেতেই রাস্তায় টহল পুলিশের সঙ্গে দেখা।

রাতে ঘোরার প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত জানালাম। ভদ্র ভাবে ছেড়ে দিল বাংলাদেশ পুলিশরা।

প্রয়োজনীয় কাজ শেষে ফিরে আসতেই বন্ধুরা জানালো, তাদেরও পুলিশ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যাবার বেলায় বলে গেছে, সামাজিক কর্ম পালন করতে গিয়ে যেন অসামাজিক ধর্ম মনে লালন না করি।

সেদিন খুব ভালো মতোই দায়িত্ব পালন করেছি। শুধু এক বন্ধু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ধোয়া- মোছার কাজ করছিল পুকুরে, তখন ঢিল দিয়ে শরীর ভিজিয়ে দিয়েছি।

সামাজিক কাজে অনেকে উৎসাহ দিচ্ছেন। অনেক যুবকরা টিটকারি মারছে। তবুও পিছপা না হয়ে চালিয়ে যাচ্ছি। যাদের বাড়ি থেকে লোকবল দেয়া সম্ভব নয় তারা আর্থিকভাবে সাহায্য করছেন।

দায়িত্বরত অবস্থায় একবার চোর ধাওয়া করা, আরেকবার অল্পের জন্য চোর ধরতে না পারা এবং একবার চোর ধরে পুলিশের সোর্পদ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে চোরের উপদ্রব নেই।

যায়যায়দিনের মাধ্যমে একটি প্রস্তাব রাখছি তা হলো, রাতে ডিউটি দিতে গেলে চায়ের পাশাপাশি হালকা খাবার ব্যবস্থা করলে ভালো হতো। রাতে জেগে থাকলে সবারই ক্ষিধে লাগে। আট দশ কাপ চা ধরে এমন একটা ফ্লাস্ক এবং এক দুইটা ছোট বিস্কিটের প্যাকেট রাখা যায় কি না অথবা সম্ভব কি না পাড়া কর্তৃপক্ষ জানাবেন কি?

পূর্ব মহিষবাথান, রাজশাহী থেকে

চায়ের টেবিলে

– মোহাম্মদ সাকিবুর রহমান খান

প্রায় বছর খানেক হয় খুলনাতে বদলি হয়ে এসেছি ঢাকা থেকে। এখানে আমার বড় মামা থাকেন। তার চিংড়ি মাছের ফ্যাক্টরি (প্রসেসিং) আছে। আমার বৌ শ্যামলী বদলি হওয়ার কথা শুনে মহা আনন্দিত হয়েছিল। তার প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চিংড়ি মাছ। আমার অল্প বেতনের চাকরিতে তাকে চিংড়ি মাছ তিন বছরের বিবাহিত জীবনে মাত্র চারবার খাওয়াতে পেরেছিলাম। আমিও মনে মনে ভাবলাম, যাক, মামার সুবাদে বৌকে চিংড়ি মাছ খাওয়াতে পারবো।

প্রথম দুই এক মাস অপেক্ষা করলাম, মামা নিজ থেকে মাছ দেন কি না। অপেক্ষার পর একদিন তার কাছে মাছ চাইলাম। তিনি পাঠিয়ে দেবে বলে আর দিলেন না।

আরো তিন চারবার চাইলাম। তিনি শুধু আশ্বাস দিয়েই গেলেন বাংলাদেশের পলিটিশিয়ানদের মতো। কিন্তু মাছ আর দিলেন না।

অথচ দেখতাম বিদ্যুৎ চুরি করার জন্য বিদ্যুতের লাইনম্যান, ব্যাংকের কর্মকর্তা, মৎস্য বিভাগের অসাধু কর্মচারী সবার বাসায় প্রায় সময় চিংড়ি মাছের কার্টন পাঠাতেন আর আমি তার অসহায় ভাগ্নে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতাম এবং জিভের পানি ফেলতাম।

পাঠকদের আমার মামা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া প্রয়োজন। তিনি ভয়ানক ধরনের কৃপণ। নিজের লাভ ছাড়া তিনি অন্য কিছুই বোঝেন না। নামে, বেনামে তার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি থাকলেও তিনি এমনভাবে জীবন যাপন করেন, তাকে দেখে মনে হয় তিনি ভয়ানক অর্থকষ্টে আছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলে পাঠকদের কাছে ব্যাপারটি পরিস্কার হবে।

তার বড় মেয়ে ঢাকার একটি বেসরকারি মেডিকাল কলেজে পড়ে। আমার মনে হয় আমার মামার যে পরিমাণ টাকা আছে তা দিয়ে তিনি ওই ধরনের দুই একটি মেডিকাল কলেজ কিনতে পারেন। অথচ মেয়েকে ভর্তি করার সময় তিনি তার পেশা হিসেবে লিখলেন মাছ কম্পানির কর্মচারী। ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় মেয়েকে দিয়ে পৃন্সিপালের কাছে দরখাস্ত লিখে অর্ধেক বেতন মওকুফ করিয়ে নিলেন।

ছেলে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। তার গৃহ শিক্ষকদের বেতন দুই মাস পর পর একবার দেন। ছোট মেয়ে ভোর ছয়টায় কোচিং সেন্টারে পড়তে যায়। আমার মোটাসোটা মামি প্রতিদিন মেয়ের হাত ধরে হেটে যান আবার হেটে আসেন। মামার যুক্তি হচ্ছে, হাটলে শরীর ভালো থাকে আর আমার মোটাসোটা মামি ঘেমে লাল হয়ে মামার গুষ্ঠি উদ্ধার করতে থাকেন।

মামার মাছ ফ্যাক্টরিতে একটি ইঞ্জিন বোট আছে। তিনি যখন ফ্যাক্টরিতে যান তখন সেই বোটে করে যান। এই বোট রূপসা ফেরিঘাট থেকে ছাড়ে আর তার ফ্যাক্টরি রূপসা ফেরিঘাট থেকে তিন কিলোমিটার ভাটিতে। যাদের রূপসা নদী সম্পর্কে ধারণা আছে তারা জানেন এই নদীটি খুব খরস্রোতা। আমার মামা যখন ভাটার সময় ফ্যাক্টরিতে যান তখন নৌকার মাঝিকে ইঞ্জিন বন্ধ করে শুধু হাল ধরে থাকতে বলেন। তার যুক্তি হচ্ছে, স্রোতের টানে ইঞ্জিন বন্ধ করে গেলে সময় লাগবে আধা ঘণ্টা এবং ইঞ্জিনে তেল পুড়িয়ে গেলে লাগবে পনেরো মিনিট। মাত্র পনেরো মিনিট সময়ের জন্য তেল পুড়িয়ে কি লাভ?

সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে লাগলাম। কিভাবে কৃপণ মামাকে শায়েস্তা করে চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়!

কয়েকদিন আগের ঘটনা। আমার ডাক্তারি পড়ুয়া মামাতো বোনকে বিয়ে দেয়ার জন্য মামা লন্ডন প্রবাসী এক লাল্টু মার্কা পাত্র ঠিক করলেন। পাত্র ও পাত্রের বাবা এলেন কন্যা দেখতে।

মামা এই পাত্র হাতছাড়া করতে নারাজ। কারণ এখানে কোনো যৌতুক লাগবে না।

চা দেয়া হলো টেবিলে।

মামা পাত্রের বাবাকে এক কার্টন চিংড়ি মাছ উপহার দিলেন।

চায়ের টেবিলে বসে সেই সুযোগটি হাতছাড়া করলাম না। মামাকে বললাম, মামা, শ্যামলী চিংড়ি মাছ খেতে চেয়েছিল, ওকেও যদি এক প্যাকেট দিতেন?

তখন আমার কৃপণ মামা চক্ষুলজ্জার ভয়ে আর তার হবু মেয়ে-জামাই ও বেয়াইয়ের সামনে নিজের দানশীলতা প্রমাণ করার জন্য আমাকে এক কার্টন চিংড়ি মাছ দিলেন।

এভাবেই সেদিন চায়ের টেবিলে আমার কৃপণ মামাকে শায়েস্তা করা গেল।

খুলনা থেকে।

sakibmsb@yahoo.com

বাজি

- পারভেজ রানা

আমাদের খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সবার চোখ থাকে নিচের দিকে অর্থাৎ নবাগত ব্যাচের দিকে। নবাগত ব্যাচের সুন্দরী মেয়েটি আগামী এক বছরের জন্য ক্যাম্পাসের সেরা সুন্দরীর খেতাব পেয়ে যায় অটোমেটিকালি। তারই ধারাবাহিকতায় বাগেরহাটের মেয়ে রিনি এলো আর নির্ঘাত এক বছরের জন্য সেরা সুন্দরীর মুকুট পরে নিল। মাটিতে যেন তার পা পড়ে না।

রিনি যতোটা না সুন্দরী তারচেয়ে বেশি প্রেফারেন্স পেয়ে গেল তার ব্যাচমেট কিছু ছেলের কারণে।

এখানে সিনিয়র–জুনিয়র জুটির চল নেই। যা জুটি সব নিজের ব্যাচের মধ্যে। আমি সিভিলের এক সিনিয়র আর সে সিএসই ডিপার্টমেন্টের নবাগতা। মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনা থাকলেও ব্যাটে– বলে হচ্ছিল না।

এরই মাঝে ক্যাফেটেরিয়ায় আমার ডিপার্টমেন্টের বেনু তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

তার মাঝে ছায়া দেখলাম আমার ছোট বোনের বান্ধবীর। ফলে আমার আগ্রহ দ্বিগুণ হলো। কিন্তু তার মধ্যে আমার সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর কোনো আগ্রহ দেখলাম না। ক্যাম্পাসে একটা সাহিত্য সংগঠন করি, তাকে যোগ দিতে বললাম।

এবারে সে আরো বেশি নির্লিপ্ত।

চার টাকা খরচ করে একদিন রোকেয়া হলে ফোনও করলাম।

সে তো আমাকে যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করলো।

যাহোক, টেলিফোন দোকানের সাইফুলভাই ছাড়া ব্যাপারটা কেউ জানলো না বলে মনে স্বস্তি পেলাম।

রিনির সর্বনাশা হাসি, দৃষ্টিকাড়া চাহনি আমাকে ক্রমেই আকর্ষণ করতে থাকলো। এরই মাঝে রিনির সঙ্গে প্রেমের ব্যর্থ চেষ্টা করে তার পিছে ঘোরাঘুরি করা ছেড়ে দিল বাগেরহাটের এক ছেলে রাজীব।

রিনি হয়ে গেল একদম একা। একাই রিকশায় ফুলবাড়ি গেটে যায়, ফিরে আসে।

আমার খারাপ লাগে রিনির জন্য। রিনি একা সেই জন্য। আমি একা সেই জন্য। রিনির ভাব বেড়ে যায়। এখন তো আর সম্ভব নয়। হতাম তার ব্যাচের, পেছনে গোদের আঠার মতো লেগে থাকতাম, দেখতাম কতোক্ষণ না প্রেম দিয়ে পারে! আমার আফসোস লাগে। সুযোগ খুজি।

দিনে দিনে রিনি আরো পরিণত হয়। সিএসই ডিপার্টমেন্টের নবীনবরণ। উপস্থাপকের একজন সহকারী দরকার। কাউকে পাচ্ছে না।

রিনিকে বলতেই সে রাজি হয়ে যায়।

তারপর সবাই রিনিকে দেখলো অন্যরূপে। নবীনবরণের সন্ধ্যায় অডিটোরিয়ামের মঞ্চে রিনি উপস্থিত হলো পূর্ণাঙ্গ এক যৌন আবেদনময়ী রমণী রূপে। তার গোল্ডেন কালারের শাড়ির প্যাচের ফাকে মেদহীন ধবধবে শাদা পেট।

অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম দর্শকের সারিতে। তার এ রূপ সহ্য করতে রীতিমতো গলদঘর্ম হয়ে গেলাম।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করার সূত্রে উপস্থাপক জুনায়েদের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক সবার নজরে পড়ে। কিন্তু জুনায়েদ আশানুরূপ সার্ভিস দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের সম্পর্ক নিষ্ফল হয়।

এর ঠিক কিছুদিন পরেই পেয়ে যাই প্রতিশোধের অপূর্ব সুযোগ।

রিনি হার্ডওয়্যারের প্রজেক্ট করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে। এসব হার্ডওয়্যারের কাজ শামীম খুব ভালো বোঝে। শামীম তাদের ক্লাসমেট।

রিনি তার পার্টনার মোর্শেদাকে নিয়ে শামীমের সহযোগিতা চায়।

শামীম আমার রুমমেট। বড়ভাই হিসেবে সে আমাকে মান্য করে। তাবলীগ জামাতে সময় লাগানো আর পড়ালেখা ছাড়া কিছুই বোঝে না।

শামীম আমাকে এসে বললো।

তাকে বললাম, তাদেরকে হেলপ করো। আরো বললাম, রিনিকে নিয়ে এক বিকেল নিউ মার্কেট ঘোরা শেষে নিউ মার্কেটের ভেতর কোনো দোকানে বসে দুজনে দুই কাপ চা খেতে পারলে তোমাকে পাচশ টাকা দেবো।

মেয়েদের ব্যাপারে বরাবরই আগ্রহহীন শামীম বললো, তার লাইফে মেয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরির রেকর্ড নেই। সে পারবে না।

তাকে বোঝালাম, কাজটা করলে রেকর্ড আগেরটাই থাকবে যেহেতু এটা বাজি। অন্য দুই রুমমেট জীবন আর মুহিতও তাকে তা–ই বোঝালো। এতে শেষ পর্যন্ত সে রাজি হলো। কিন্তু একদিনই শুধু ঘুরবে এবং তারপর তাকে আর কোনোদিন কাজটা করতে বলা যাবে না শর্ত দিল।

সব শর্ত মেনে নিলাম।

রিনি আর মোর্শেদাকে স্টেপার মোটর বোঝায়, ল্যাবে সময় দেয়, হলের গেস্টরুমে সময় দেয় শামীম।

তাকে টিপস দিই, কাজটাকে সফল করো।

শামীম পারলো। সত্যি সত্যিই একদিন রিনিকে নিয়ে নিউ মার্কেটে ঘুরলো। দোতলার একটা দোকানে ঢুকলো। চা খেলো।

আমার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দোকানে ঢুকলাম।

এ সময়ে রিনি এতোগুলো ছেলেসহ আমাকে ওখানে দেখে বিব্রত হলো।

শামীমকে বললাম, কনগ্রাচুলেশন্স, তুমি পেরেছো। এই নাও রিনিকে নিয়ে চা খাওয়ার বাজিতে জেতার পাচশ টাকা।

ব্যাপারটা আসলে কি ঘটলো তা বুঝতে রিনি কিছু মাত্র সময় নেয়নি। প্রচণ্ড অপমানে সে শামীমকে সহ্য করতে পারলো না। মুহূর্তে দোকান ছেড়ে বের হয়ে গেল।

শামীমকে পিছু পিছু যেতে বললাম।

শামীম তাই করলো।

রিনি তাকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করলো, শামীমের মনমানসিকতা জঘন্য ইত্যাদি কথা শোনালো।

শামীম ফিরে এলো। বললো, ভাই কাজটা মনে হয় ঠিক করিনি।

আরে বাজি তো বাজিই। ও রকম কতো ঘটে।

কিন্তু শামীমকে কিছু বোঝাতে পারলাম না।

এরপরের ঘটনা কি হবে? তা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। হাজার হোক বাগেরহাটের মেয়ে বলে কথা! বাগেরহাটের মেয়েরা নাকি সিরিয়াস হয়।

শামীমকে দিয়ে কেন আমি এমন কাজ করিয়েছি তা রিনির জানতে সময় লাগলো আটচল্লিশ ঘণ্টা।

আট দিন পরে একই চায়ের দোকানে রিনিকে দেখা গেল। এবারে আর শামীম নয়, রিনির মুখোমুখি নিজেকেই আবিষ্কার করলাম।

খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

প্রতিশব্দ

- ইকবাল মামুন

চা বাগানে বহুল প্রচলিত শব্দ যা আমাদের সামাজিক নগর জীবনে অপ্রচলিত তার কিছু নমুনা তুলে ধরলাম।

নগর জীবনে প্রচলিত	**চা বাগানে প্রচলিত**
ম্যানেজার	বড়সাব
অ্যাসিসটান্ট ম্যানেজার	ছোটসাব
গেস্টরুম	ফালতু কামরা
সিগারেট অ্যাশট্রে	রাখিদানি
মোটর সাইকেল	ভটভটি
প্রাইভেট কার	ফার্স্ট ক্লাস
রেফ্রিজারেটর	ঠাণ্ডা বাক্স
সফট ড্রিংকস	মিঠা পানি
হার্ড ড্রিংকস (মদ)	পাগলা পানি
পিয়ন	চৌকিদার
নাইট গার্ড	রাইত চৌকিদার
কেরানি	বাবু
বাবুর্চির হেলপার	পানিওয়ালা
জেনারেটর	ইঞ্জিন
মাইক্রোবাস	লাইটেজ

মগবাজার, ঢাকা থেকে

দন্ত পতন সমাচার

– মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

গণ্ডগ্রামের ছেলে আমি। শহরে যাওয়ার তেমন সুযোগ পাই না। নতুন ক্লাসে উঠলে বই কেনা উপলক্ষে শহরে যাওয়ার সুযোগ পাই।

১৯৬৪ সালের কথা। ক্লাস এইটে উত্তীর্ণ হয়েছি। ক্লাস শুরু হয়েছে। সিলেবাস অনুসারে বই কেনা জরুরি। প্রতিদিন বই না কেনার জন্য বকা খাচ্ছি। সেদিন সকালে মায়ের কাছ থেকে অনেক অনুনয়–বিনয় করে ত্রিশটি টাকা পাওয়া গেল। আমি আর আমার বন্ধু শরিফুল কুষ্টিয়া শহরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

মজমপুর রেলগেট থেকে নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা রোড দিয়ে যাত্রা। পায়ে হেটে হাফিজ বুক ডিপো। ওখান থেকে বই কেনার পর কনসেশন বাবদ চার টাকা অবশিষ্ট। আট আনা, আট আনা বাস ভাড়া, বাকি তিন টাকা অনায়াসে ওড়ানো যায়। দুই বন্ধু অনেক চিন্তা–ভাবনা করে স্থির করলাম চা খাবো।

নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা রোড দিয়ে ফিরতে থাকি। হোটেল দেখলেই ঢুকবো কি ঢুকবো না চিন্তা করি। বেশ কিছু দূর হেটে এসে শেষে *আফসার হোটেল*–এর সামনে এসে দাড়ালাম।

হোটেলে লোকজনের আনা–গোনা দেখে গণ্ডগ্রাম থেকে আসা দুজন কিশোরের পক্ষে হোটেলে ঢুকতে সাহস হয় না। দুই বন্ধু অনেকক্ষণ হোটেলের সামনে দাড়িয়ে লোকজনের আসা–যাওয়া, খাওয়া–দাওয়া দেখলাম। একবার ঢুকতে সাহস করি তো দুবার পিছিয়ে পড়ি।

দুজন অনেকক্ষণ হোটেলের সামনে দাড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করে বুকে ফু দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। এরপর কোনো একটি টেবিল নির্বাচন করে জড়সড়ো হয়ে মুখে হাত দিয়ে বসি। সঙ্গে সঙ্গে যমদূত প্রায় মোটা বেটে এক লোক এসে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলো, *কি দেবো? কি খাবা?*

আমরা বললাম, চা খাবো।

খালি চা খাবা। দুডে সিঙাড়া দি।

আমরা ভয়ে ভয়ে বললাম, না, শুধু চা।

কড়া করে দেবো?

আগে কোনোদিন চা খাইনি, তাই কড়া নরমের কিছুই জানি না। কোনো রকমে হ্যা সূচক উত্তর দিলাম।

অল্পক্ষণ পরে ওই লোকটা দুই কাপ চা এনে টেবিলে সজোরে আঘাত করে রেখে গেল।

আমাদের চা খাওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের গ্রামে চা খাওয়া নিয়ে কিংবদন্তীতুল্য অনেক গল্প প্রচারিত আছে। অজিবর বিশ্বাস কিভাবে চা খেয়ে দাম না দিয়ে হোটেলওয়ালাকে ফাকি দিয়েছিল, শের আলি কিভাবে হোটেল বয়কে ধমক দিয়েছিল এবং কিভাবে কোনো টাকা না দিয়েই একশ টাকা দিয়েছে দাবি করে বাকি টাকা ফেরত এনেছিল। এসব গুল শুনে শুনে অনেক উৎসাহ নিয়ে চা খেতে এসেছি।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একজন অন্যজনকে বলি, তুই আগে নে, ও আমাকে বলে তুই নে। এভাবে অনেকক্ষণ ঠেলাঠেলি। শেষমেশ সিদ্ধান্ত দুজন এক সঙ্গে মুখে দেবো। *হয় মন্ত্রের সাধন নয় শরীর পতন*।

চা মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জিভের পর্দা ঝলসে গেল। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ নামিয়ে হা করে রইলাম। ওই লোকটার কাছে এক গ্লাস পানি চাইলাম।

ওই লোকটা দূরে দাড়িয়ে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছে। সে পানি না এনে আমাকে বললো, *গিরামেত্থে আইচো, তাই না? জীবনে কোনোদিন চা খাইচো। চা খাওয়ার পর কেউ পানি খায়? জানো না চা খাওয়ার পর পানি খালি দাত পড়ে যায়।*

দন্ত পতনের বিষয়টি আমাদের দুজনের কারোরই জানা ছিল না। ওই কথা শুনে আমি দন্ত পতনের আশঙ্কায় অস্থির। কিছুক্ষণ পর পর দাতে হাত দিয়ে দেখি। না ঠিক আছে। দাত পড়েনি।

অতঃপর চায়ের বিল দিয়ে বাইরে এলাম।

এরপর বহুদিন দন্ত পতনের ভয়ে চা খাইনি।

রাজবাড়ী থেকে

সবাই মিলে খা

- চন্দ্রমল্লিকা

ভীষণভাবে চা পছন্দ করি। চা না হলে আমার চলেই না। যদি কোনোদিন কোনো কারণে চা খাওয়া হয় না তাহলে শুরু হবে আমার মাথা ব্যথা। চা না খাওয়া পর্যন্ত এই মাথা ব্যথা সারবে না।

আমার সকালটা শুরু হয় চা দিয়ে আর সারা দিন কাজের ফাকে ফাকে এক কাপ করে চা চলবেই। অনেকেই বলে থাকেন, চা খেলে নাকি ঘুম হয় না। কিন্তু রাতে ঘুমানোর আগে এক কাপ চা না হলে আমার ঘুমই আসে না।

এদিকে রঙ চা আমার ভীষণ অপছন্দ। রঙ চা একেবারেই খেতে পারি না। অনেকেই ভাবে এটা আমার ফ্যাশন।

আসলে তা নয়। চেষ্টা করেছি রঙ চা খাওয়ার। কিন্তু পারি না কেন জানি না। এই চা মুখের সামনে নিতেও আমার কষ্ট হয়, কেমন জানি লাগে। লিখে বোঝাতে পারবো না। এমনো দিন আছে, যেমন ঘরের দুধ শেষ হয়ে গেছে, আনানো হয়নি, তখন ঘরের অন্য সবাই রঙ চা খেয়ে ফেললো শুধু আমি খেতে পারলাম না। তখন হয় খুচরা দুধ আনিয়ে চা খেতে হয়। না হলে আর চা খাওয়া হয় না। শুরু হবে তখন সেই মাথা ব্যথা। রঙ চা না খাওয়ায় অনেক সময় অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

কারো বাসায় বেড়াতে গেলে অনেক সময় রঙ চা দিয়ে দেয়। তখন রঙ চা খাই না এ কথা বলতেও পারি না আবার খেতেও পারি না।

আমাদের ফ্যামিলিতে প্রায় সবারই চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। এক সময় আব্বা ভীষণ গরম চা পছন্দ করতেন।

চা বানিয়ে দিয়েছি তো আব্বা বললেন, কি চা দিয়েছিস, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আবার গরম করে নিয়ে আয়।

আব্বা এখন আর আগের মতো গরম চা খেতে পারেন না।

আমাদের দূরসম্পর্কের এক মামি আছেন যিনি এতো গরম চা খেতেন যে চা শেষ করে মুখের ভেতরের গলানো চামড়া তুলে এনে দেখাতেন। এখন তিনি আর আগের মতো গরম চা খেতে পারেন না।

প্রায়ই শোনা যায় একটি কথা, যাদের বাড়ির চায়ে চিনি কম তারা নাকি খুব বিকট ধরনের মানুষ হয় আর যাদের বাড়ির চায়ে চিনি বেশি তারা খুব দিলখোলা প্রকৃতির হয়।

চা নিয়ে রাজনীতিতে একটি কথা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। তখনো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া। তিনি নাকি বিরোধী দলীয় নেতা-নেত্রীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন - *রাজপথে নয়, ঘরে আসুন। চা খেতে খেতে আলোচনা হবে*। এই উক্তিটি মানুষের মুখে মুখে ছিল অনেক দিন।

এক কাপ চা

সবাই মিলে খা

মুসলমানের ভালোবাসা

সালমান শাহ।

সেদিন ছোট্ট মামাতো বোনের মুখে এই ছড়াটি শুনে আমি তো অবাক। কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি বলে জানা হলো না এটা সে কোথা থেকে শিখেছে।

কানিশাইল, সিলেট থেকে

ভুটানিজ টি

– ফারাহ্ আজাদ দোলন

ছোটবেলায় নানিবাড়ি যেতাম। আমার প্রয়াত নানি উকিল গিন্নিবাড়ির গরুর ঘন দুধ আর খেজুরের গুড় সহযোগে বড় হাড়িতে তৈরি করতেন এক অসাধারণ চা। উপরে সরের টুকরো ভাসতো আর আমরা অনেক মামাতো খালাতো ভাইবোনেরা সেই চা পাবার জন্য শীতের সকালে ছোট ছোট কাপ হাতে উঠোনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতাম। নানি বড় একটা ডালের চামচ দিয়ে দুই চামচ করে চা বিলাতেন। এর মজাই ছিল আলাদা।

মোড়ল গিন্নি পরিবেশিত কাসার বাটি ভর্তি থাকতো মহিষের দুধ আর খেজুরের গুড়ের চা।

এরপর যে চায়ের প্রতি ভালোবাসা তা হলো রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের চা। আশির দশকে তখন আমরা ছাত্র। ড. জোহার মাজার বরাবর মেইন গেটের সামনেই যে চায়ের দোকান ছিল তাতেই ছিল

আমাদের গ্রুপটার আড্ডা। গরুর ঘন দুধ আর কড়া লিকারের চায়ের কাপ হাতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং টিভি প্রোগ্রাম ও সিনেমা নিয়ে আলোচনায় টেবিল কাপাতাম।

আজ সর্বত্রই গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে কনডেন্সড মিল্ক জায়গা দখল করেছে। চায়ের সেই স্বাদও গেছে পাল্টে।

দেশের বাইরে প্রথম গেলাম ১৯৯১ সালে ভুটানে। উচ্চবিত্ত ভুটানিজরা ভালো ইংরেজি বললেও এবং খেতে বা ড্রিংক করতে পছন্দ করলেও সচরাচর কাউকে বাসায় আমন্ত্রণ জানায় না। ভালো রান্না করা বা অতিথি আপ্যায়নের কালচার তাদের জানা নেই। তাই বাসায় ইনভাইট করলে তারা হাতে করে কোনো গিফট নিয়ে আসে।

একবার মিস্টার এবং মিসেস নাদিক আমার বাসার পার্টিতে প্রথম দিন এলেন এক প্যাকেট দার্জিলিং টি নিয়ে। বললেন, মিসেস আহমেদ, ট্রাই করো, খুব ভালো ফ্লেভারড টি।

এতো দিন এতো নাম শুনেছি, সেই দার্জিলিং টি হাতে পেয়ে আত্মহারা হয়ে চা বানালাম।

ঘন লিকারে দুধ মিশিয়ে খেতে গেলাম, মহা তিতকুটে। পাতলা লিকারে দুধ মেশালাম তো মহা পানসে।

মি. নাদিক ও মিসেস নাদিক দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করেন, চা কেমন লাগলো।

আমতা আমতা করে কেটে পড়ি। ভাবলাম নাদিক এতো বড় বাংলাদেশ ভক্ত হয়ে এমন চা গিফট করলো!

পরে অবশ্য ভুটানরাজের তৎকালীন পুলিশ অ্যাডভাইজার মি. ব্যানার্জির বাড়িতে গিয়ে দার্জিলিং চা খাবার পদ্ধতি শিখলাম। এটা মূলত ফ্লেভারের জন্যই বিখ্যাত। ফুটানো গরম পানিতে চায়ের পাতা ফেলে ঢেকে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর লিকারে চিনি মিশিয়েও খাওয়া যায়।

অথবা বৌদি বললেন, কড়া লিকারের চা পাতা অর্ধেক মিশিয়ে দুধ দিয়েও খেতে পারো।

দাদা–বৌদির আদি বাড়ি যেহেতু বাংলাদেশে, তাই আমাদের চা খাওয়ার হ্যাবিটটা বুঝতে পেরেছিলেন।

চা খাবার আরেক মজার অভিজ্ঞতা দিয়ে শেষ করছি। ভুটানে যাবার পর বাংলাদেশি এবং ইনডিয়ান শুভাকাঙ্ক্ষীরা বার বার সাবধান করে দিল ভুটানিজ চা খাবার নিয়ম সম্পর্কে। সেটা হলো, ভুটানের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বা পারিবারিক পরিবেশে আমন্ত্রিত হয়ে যখন কেউ যায় তখন তাদের ট্রাডিশনাল চা পরিবেশন করা হয়। চা ভর্তি একটা বড় কেটলি থেকে ছোট্ট চায়নিজ কাপ বা বাটিতে পরিবেশিত এই চা যদি কেউ এক কাপ খেয়েই *থাংকস* বলে রেখে দেয়, তাতে তারা আহত হন, অপমানিত বোধ করেন। গৃহকর্তা বার বার শূন্য পাত্র পূর্ণ করবেন এবং অতিথি তা পান করতেই থাকবেন। এতেই নাকি তারা অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করেন।

আমাদের বলা হলো, আমরা যেন চা দ্রুত পান না করি।

পরবর্তীকালে আমি ও আমার হাজব্যান্ড ওই চায়ের স্বাদ গ্রহণ করি। এটা তৈরি হয় বাটার, লবণ, বিশেষ ধরনের চা পাতা ও গরম পানি সহযোগে। খাবার সময় মাখনের কারণে গলা মৃদু জ্বালা করে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে আমরা এই চা সাদরেই গ্রহণ করতাম অন্তত তিন কাপ পর্যন্ত।

তবে ভুটানিজরা স্বাভাবিক চা, কফিতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ইদানীং।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বাবা

– মাসুদা সিদ্দিকা

আমার বাবা দিল্লি থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন আর সেখান থেকেই ওনার চা খাওয়ার অভ্যাস শুরু হয়। সেখানকার কতো রকম চায়ের গল্প বলতেন।

মনোযোগ দিয়ে শুনতাম।

বাবা চা খেতেন দিনে পাচ ছয়বার। চা পেলে খুব খুশি হতেন।

আমিও সময় পেলেই বাবাকে খুশি করার জন্য চা তৈরি করে দিতাম। চায়ে চিনি অর্ধেক কাপ আর খুব গরম চা খেতেন।

অনেক ব্যস্ততার মাঝে চা তৈরি করে ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত নিয়ে যেতেই বলতেন, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তখন রাগ করতাম আবার হাত ধরে রান্নাঘরে মোড়া পেতে বসতে দিয়ে চা গরম করে দিতাম।

বাবা বায়না ধরতেন, আমি যেন চা খাই।

বলতাম, কোনোদিন চা খাবো না।

অথচ সেই আমি এখন দিনে তিনবার চা খাই। যখনই চা খেতে যাই তখনই বাবার কথা মনে পড়ে। চা যে আমারও এতো প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় খাবার হবে তা কখনো ভাবিনি। বাবাকে কখনো কোনো জিনিসের জন্য অন্যায় আবদার করতাম না। কিন্তু মাঝে মধ্যে চানাচুর আনতে বলতাম।

বাজার থেকে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে বলতেন চোখ বন্ধ করো, হাত পাতো।

আমিও তা-ই করতাম।

বাবা আমার হাতের ওপর একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, চোখ খোলো।

চোখ খুলে তো অবাক! বাবা আমার হাতে চায়ের প্যাকেট দিয়েছেন। খুব রেগে যেতাম।

তারপর চানাচুরের প্যাকেটটা দিতেন।

খুব খুশি হতাম। বাবা-মেয়েতে হাসিতে ফেটে পড়তাম।

আজও মনে হলে দুই চোখ ভরে পানি আসে।

বাবা কারো মুখের খাবার খেতে চাইতেন না। কিন্তু একদিন বাবার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, তারপর পেয়ালাটা রেখে দিতেই বাবা নিয়ে বাকি চা খেয়ে ফেললেন।

খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। সংসারে কাজের চাপে, পড়াশোনা সব মিলিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতাম। তারপরও বাবাকে চা করে দিতাম।

অথচ সেই বাবা আজ আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে থাকেন। জানি না আমার মতো যত্ন করে কেউ তাকে চা করে দেন কি না। জানি না বাবা আমাদের ছেড়ে কতো ভালো থাকেন বা আছেন। বাবার ধারণা, মেয়েরা বিয়ে হয়ে গেলে পর হয়ে যায়। তাই আমাদের সব বোনকে পর মনে করেন। সেই কারণে আমাদের কাছে থাকেন না। এমনকি দেখতেও আসেন না।

নিজেরাও সংসার, চাকরি সব ছেড়ে সময় করে উঠতে পারি না তার কাছে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসবো। হয়তো স্বার্থপর হয়ে গেছি, কর্তব্যহীনতার পরিচয় দিচ্ছি।

সারা জীবন আদর্শ, নীতিবান বাবা আমাদের নীতিহীন করে, অভিমান করে দূরে সরে আছেন। আমরা বোনগুলো তাকে খুব ফিল করি, বিশেষ করে আমি বেশি ফিল করি, মিস করি তাকে। তাই তো শত কাজের ভিড়ে, শত ব্যস্ততার মাঝেও দুঃখ-কষ্টে, বেদনায়-আনন্দে শুধুই বাবাকে মনে পড়ে। বাবার সেবা করতে পারলাম না বলে বড় অপরাধী মনে হয়।

মনে হয় এখন বাবা যদি আমার কাছে থাকতেন তাহলে অনেক রকম করে চা বানিয়ে খাওয়াতাম, একটুও বিরক্ত বোধ করতাম না। কিন্তু হায়, সেদিন বুঝি আর কোনোদিন আসবে না!

রান্নাঘরে তাকের ওপর সাজানো চায়ের কৌটাগুলো চোখে পড়লেই বাবাকে খুব গভীর করে মনে পড়ে। দোয়া করি, বাবা যতো দূরে থাকুন, যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

ধাপ, রংপুর থেকে

নিজেরে হারিয়ে খুজি

– নোমান

চায়ের লিকারের সঙ্গে চিনির মতো জড়িয়ে আছে আমার অতীত মধুময় স্মৃতি। ১৪ এপৃল ১৯৭১। মুজিবনগরের (তখন বদ্যিনাথতলা) আম্রকাননে গঠিত হলো বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। আগে সিদ্ধান্ত ছিল চুয়াডাঙ্গায় সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু পাক বাহিনীর আক্রমণের আশংকায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। তবে পাক বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল থেকে চুয়াডাঙ্গা বাদ পড়েনি। পাক বাহিনীর বিমান থেকে মর্টার ও শেলের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয় চুয়াডাঙ্গা শহর।

আনুমানিক বেলা দুটার দিকে আমরা মেহেরপুর পৌরসভার সামনে একত্র হয়েছি খবর জানার জন্য।

ডা. আসহাব-উল-হক (হ্যাবা ডাক্তার) আমাকে ও আমার সঙ্গে লাইব্রেরিয়ান আজিজুল মিয়াকে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের মাইক্রোবাস দিয়ে বললেন, তোমরা চুয়াডাঙ্গা গিয়ে বাস্তব অবস্থাটা দেখে এসো আর আহত লোকজন পেলে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

নির্দেশ অনুযায়ী রওনা হলাম। কিন্তু বাড়াদি কৃষি ফার্মের সামনে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই মাথার ওপর বিমান চক্কর দেয়া শুরু করলো।

ড্রাইভার ভয়ে কাদতে কাদতে গাড়ি ফেলে পালিয়ে গেল।

আমরা রাস্তার পাশের খাদে গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম।

পরে ড্রাইভারকে খুজে অনেক বুঝিয়ে বিকাল পাচটার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরে পৌছালাম।

সমস্ত শহর খা খা করছে। জনমানব শূন্য। মনে হয় না শহরে লোকজন বাস করতো। আহত নিহত কোনো মানুষের সন্ধান মিললো না। তবে বৃজের ওপর এবং চৌরাস্তায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখা গেল। সঙ্গীকে বললাম, একটু অপেক্ষা করেন, আমি বাড়ি গিয়ে বাবা-মায়ের অবস্থাটা জেনে আসি।

বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে রাস্তায় এসে দেখি গাড়ি নেই। এখন কি করা! সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে আর সেই সঙ্গে পাক বাহিনীর কামানের গোলার আওয়াজও এগিয়ে আসতে থাকে। শেষে বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির অনতিদূরে রেললাইন ধরে দর্শনার দিকে রওনা হলাম। হাটা অভ্যাস নেই। তবুও হাটতে হবে অজানার পথে। এক সময় দর্শনা সীমান্তে পৌছালাম। ওপারেই ইনডিয়ার গেদে স্টেশন। হাজার হাজার মানুষ সীমান্তের এপারে জমা হয়েছে। এখন কোথাও যাবার ট্রেন নেই। কাজেই স্টেশনে বিশ্রাম নেয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। সকাল ছয়টার সময় ট্রেন। অপেক্ষার পালা। বিনিদ্র রজনী। অজানা অচেনা পথ। সেই সঙ্গে মেহেরপুরে বৌ বাচ্চা রেখে এসেছি, তার চিন্তায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমার মন।

এক সময় সকাল হলো, ট্রেনও এলো। ট্রেনে কোনো টিকেটধারী যাত্রী নেই। সবাই বাংলাদেশি, এখানে আশ্রয়প্রার্থী। ট্রেন রানাঘাট পৌছালো। এখান থেকে ট্রেন পাল্টে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্য যাত্রা। লক্ষ্য খালা অথবা ফুপুর বাড়ি আশ্রয়।

ভাবলাম, বাবা মাকে রেখে বেতাই সীমান্ত দিয়ে মেহেরপুরে প্রবেশ করে বৌ বাচ্চার সন্ধান করবো।

ট্রেন দশটার দিকে কৃষ্ণনগর স্টেশনে পৌছালো।

রিকশা নিয়ে বাবা মায়ের সঙ্গে খালার বাড়ি পৌছালাম।

কিন্তু একি! স্বপ্ন দেখছি না তো? খালার বাড়ির দরজায় বাচ্চা কোলে বৌ দাড়িয়ে হাসছে। আনন্দে দুজনেরই চোখে পানি। আমাদের হৃদয়ের আবেগ তো আর কেউ অনুভব করতে পারছে না। আল্লাহ পাকের কাছে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম যে আমাকে সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিল।

যাহোক, ঘরে ঢুকে গা এলিয়ে দিলাম। বৌয়ের সঙ্গে তার এখানে পৌছানোর কাহিনী শুনছি। এমন সময় হাসিমুখে একটা টিনের প্লেটে কয়টা শুকনা রুটি আর টিনের মগে লাল চা হাতে এক বধূ ঢুকলেন।

কোনো রকম ভণিতা না করে বলতে শুরু করলেন, নাও ঠাকুরপো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। খাও আর প্রেমালাপ করো।

যেভাবে আসা সেভাবেই প্রস্থান।

বৌয়ের কাছে শুনলাম ইনি আমার বুড়ি বৌদি। আসল নাম কি জানার চেষ্টা করিনি। প্রয়োজনও হয়নি। আমার খালাতো ভাই শহরের একজন সেরা মাস্তান। কোনো এক হিন্দু পরিবারের মেয়েকে লুটে এনেছে। দুজনের অ্যাডজাস্টমেন্ট চমৎকার। অত্যন্ত আলাপী। কয়েকদিনেই ঘুচে গেল সব দূরত্ব। তুমি থেকে এখন তুই – এ চলে এসেছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি আমার খালাতো ভাইয়ের প্রায় বিশ বছরের ছোট। আমি, আমার বৌ দুজনেই তাদের খুব প্রিয় আর বাচ্চাটার তো আদরের সীমা নেই। ইতিমধ্যে শুকনা রুটি লাল চায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

সাধারণ ইনডিয়ানদের জীবনযাত্রা খুবই শাদাসিধা। কোনো বাহুল্য নেই। খাওয়া–পরাতে নেই কোনো বিলাসিতা। সুযোগ পেলেই বুড়ি বৌদি তাদের প্রেমের কেচ্ছা কাহিনী শুনাতে কার্পণ্য করেন না। আমাদের মতো সমঝদার শ্রোতা পেয়ে তিনি অসংকোচে তার কাহিনী বলে যান। গল্পের শেষে প্রতিদিন বলতেন ঠাকুরপো, তুই একদিন অনেক বড় হবি। সমাজে তোর নামডাক হবে। তোর ছেলেমেয়েরা অনেক বড় হবে। বলতে বলতে কেমন যেন উদাস হয়ে যেতেন।

বৌদি নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন বিকেলে আমি রিলিফ ক্যাম্পে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। হঠাৎ লাল চা সামনে হাজির।

যাবার আগে বিকেলের চা। খুবই আগ্রহের সঙ্গে গ্লাসে চুমুক দিলাম। এরপরের দৃশ্য আমার লাফালাফি আর বৌদির হাসিতে লুটোপুটি।

চায়ের গ্লাস ছুড়ে ফেলেছি।

আমার চিৎকার লাফালাফিতে পাশের ঘর থেকে বৌ ছুটে এসেছে।

তারপরে বাড়িতে যারা আছেন, সবাই ঘরে জড়ো হয়েছেন।

বুড়ি বৌদি সমানে হেসে চলেছেন।

এমন সময় আমার দস্যি ভাইটা হাজির। তার বুঝতে বাকি নেই, আমাকে চায়ের সঙ্গে মরিচের গুড়া খাওয়ানো হয়েছে। ভাইয়ের কষ্ট দেখে তার সহ্য হলো না। বৌদির চুল ধরে বিছানা থেকে উঠিয়ে পেটাতে শুরু করলেন। কিন্তু বৌদির হাসির কোনো বিরতি নেই। নির্মল, নিষ্কলুষ হাসি।

সবাই ভাইকে বকা শুরু করলেন। সে তার ঠাকুর পোর সঙ্গে একটু মজা করেছে, তুমি এর মধ্যে বাদ সাধতে এলে কেন বাবা!

যাহোক, ভাই রাগে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

পরে বৌদি উঠে এসে দরদ ভরা কণ্ঠে বললেন, খুব কষ্ট পেয়েছিস, তাই না? বলতে বলতে তার চোখের কোণে এসে গেল পানি।

বললাম, না। খুব আনন্দ পেয়েছি। দেখলে না, আনন্দে কেমন নাচ করছিলাম।

এবার আবার ফিক করে হেসে ফেললেন। বললেন, খুব দুষ্টু তুই।

অনেক দিন হয়ে গেছে। বৌদিও পরলোকে চলে গেছেন। এখনো মাঝে মধ্যে চায়ের কাপের মধ্যে দেখি দুষ্টুমি ভরা চোখ মেলে যেন তাকিয়ে আছেন আমার বুড়ি বৌদি।

চুয়াডাঙ্গা থেকে

বৌ- শাশুড়ির যুদ্ধ

– মোহাম্মদ ওয়ালিদ পাশা নাহিদ

আমার পাশের বাড়িতে নতুন বৌ এসেছে প্রায় নয় মাস হলো। এর মধ্যে ওই বাড়িতে অনেকবার বৌ–শাশুড়ির যুদ্ধ হয়েছে। অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু চা খাওয়ার কারণে।

শাশুড়ি বাজার থেকে চিনি কিনে আনে অতিথিদের সরবত খাওয়ানোর জন্য এবং চা খাওয়ার জন্য। কিন্তু দেখা যায়, চিনি আনার দুই দিন পর চিনি নিঃশেষ হয়েছে। দিনে কয়েক ডজনবার বৌ চা খায়। চা যেন নেশা বৌ–এর।

যখন কোনো অতিথি আসে তখন আর শরবত দেয়ার মতো চিনি থাকে না। এ নিয়ে বৌ–শাশুড়ির নিয়মিত ঝগড়া হয়।

এ মহল্লায় এটি আলোচিত, সমালোচিত কাহিনী।

এখন খোজ নিয়ে জানতে পেরেছি, শাশুড়ি চিনি এনে তালা মেরে রাখেন। দুই বেলা দুই কাপ চায়ের জন্য চার চামচ চিনি দেয়ার নিয়ম চালু করেছেন।

এ ঘটনা লিখছি এ কারণে যে, এটি যারা পড়বেন, অন্তত্পক্ষে সেই সকল পরিবারে যাতে এ রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে।

সকলকে মিতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আবার বেশি মিতব্যয়ী হলে যুদ্ধ লাগবে। অতএব সাবধান। বেশি মিতব্যয়ী নয় আবার বেশি উদারও নয়। মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতে হবে। তবেই শান্তিপূর্ণ স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হবে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

nahid-atoze@yahoo.com

সুনামি

- লুলু বিলকিস

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে আমার বড় ছেলে রাফীর চেকআপ–এর জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল চেন্নাই–এর শংকর নেত্রালয় হসপিটালে। এর আগের বছর তার একটি চোখে বড় ধরনের একটা অপারেশন করা হয়েছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শ মতে পরের বছর চেকআপ করাতে গিয়েছিলাম।

ডিসেম্বর মাস। স্টুডেন্টদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। কৃশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের বড়দিনের উৎসব, সর্বোপরি ইংরেজি বর্ষের শেষের রাতটির বিদায়ী উৎসব এসব কিছুর প্রভাব পড়েছিল ইনডিয়ান দূতাবাসে। তাই সাত দিন লাইনে দাড়িয়ে ভিসা জোগাড় করেছিলাম। ভিসা পেয়ে আর দেরি করলাম না। সেদিনই রাত দশটার বাসে সড়ক পথে রওনা হলাম কলকাতার উদ্দেশ্যে। পরদিন বেলা তিনটায় কলকাতা গিয়ে পৌছালাম।

সেখানে গিয়ে আরেক সমস্যায় পড়লাম। সাত দিনের মধ্যে মাদ্রাজের (চেন্নাই) টিকেট পাওয়া যাবে না বলে টিকেট প্রাপ্তির স্থানগুলো থেকে জানা গেল।

অবশেষে ব্ল্যাকে ডাবল দাম দিয়ে টিকেট সংগ্রহ করে চেন্নাই–এর উদ্দেশ্য রওনা হলাম। সেদিন ছিল ২৫ ডিসেম্বর। বেলা তিনটায় করমণ্ডল ট্রেনে উঠে নির্ধারিত সিটে গিয়ে বসলাম। ওই কম্পার্টমেন্টে আমাদের সহযাত্রীদের মাঝে দুইজন ছিল বাঙালি, চারজন রাজস্থানি এবং তিনজন তামিল। এদের মাঝে অধিকাংশই ছিল আমার ছেলে রাফীর সমবয়সী। তাই তাদের সঙ্গে রাফীর বেশ ভাব জমে উঠলো। পরিবেশটা ছিল উৎসবমুখর। আমরা সবাই মিলে উপভোগ করছিলাম।

কলকাতা থেকে চেন্নাই যেতে দুই রাত দেড় দিন সময় লাগে। এর আগেরবার আমাদের রেল ভ্রমণটা ছিল খুবই কষ্টকর। সেই অভিজ্ঞতায় মন স্থির করা ছিল, এবারও তাই হবে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হওয়ায় বেশ ভালো লাগছিল।

২৫ ডিসেম্বর রাত কেটে গেল নানান রকম আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে। পরের দিনও প্রায় এভাবেই কেটে গেল।

২৬ ডিসেম্বর রাত খুব একটা জাগা হলো না। সবাইকে মনে হলো বেশ ক্লান্ত। আগের দিনের তুলনায় একটু আগেভাগেই রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একে একে প্রায় সকলেই নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়লো। কিন্তু আমার চোখে কেন যেন ঘুম আসছে না।

ট্রেনের ঝিক ঝিক শব্দ এবং রাতের নির্জনতা আমার কাছে এক স্বপ্নপুরীর মতো মনে হতে লাগলো। এমন এক রোমান্টিক মুহূর্তে নিকট দূর অতীতের কতো স্মৃতি এসে ভিড় করলো, সব মিলিয়ে যেন অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। হঠাৎ একটা করুণ যন্ত্র সঙ্গীত রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে আমার কানে এসে বাজলো।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে লক্ষ্য করলাম, ট্রেনটির গতি ধীর হয়ে আসছে। এক সময় ট্রেনটি থেমে গেল। রাতের নিস্তব্ধতায় সেতারের করুণ সুরটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে।

ইতিমধ্যে একজন, দুজন করে যাত্রীরা ঘুম থেকে জেগে উঠতে লাগলো। তারা জানালা দিয়ে মাথা বের করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে আসলে ব্যাপারটা কি?

আমাদের এক সহযাত্রী রাজস্থানি ভদ্রলোক বলে উঠলেন, দেখো দেখো, লটর-ভটর হয়েছে...।

আরো অনেক কথাই বললেন। কিন্তু আমি এর কোনো মানে বুঝতে না পেরে জানালা পথে চেয়ে দেখলাম ট্রেনের দুই পাশ দিয়ে পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

এক দুই করে ট্রেনের অধিকাংশ লোক জেগে উঠেছে। সবার চোখে-মুখে অজানা এক আশংকায় কালো মেঘ জমে উঠেছে।

ঘন্টা দুই পর ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো। তবে খুব ধীর গতিতে।

পরদিন রাত সাড়ে দশটায় চেন্নাই গিয়ে পৌছালাম। এতো রাতে অন্য কোনো হোটেলে না গিয়ে গতবারের হোটেলে যাওয়াটাই ভালো মনে করে একটা ট্যাকসি ক্যাব নিয়ে মোগারাপ্পা স্ট্রিটের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মোগারাপ্পা স্ট্রিটের হোটেলের নাম *আলম ম্যানশন*। চেন্নাই সি-বিচের দুইশ গজের মধ্যে এর অবস্থান।

যেতে যেতে দেখলাম শহরের রাস্তাঘাট ভেজা। এখানে তো বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। তবে এ সময় এখানে কিসের পানি! ভাবতে ভাবতে এক সময় হোটেলের সামনে গাড়ি এসে থামলো।

তিনি আমাদেরকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হলো। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, একটি মাত্র রুম খালি আছে। রুমের চাবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, যান, ঘর পরিষ্কার করা আছে।

মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। দরজা খুলে কোনো রকম লাগেজগুলো রেখেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে দুই চোখ বুজে এলো।

দরজায় খট খট শব্দ শুনে ঘুম ভাঙলো। চেয়ে দেখি জানালার ফাক দিয়ে ভোরের আলো ঢুকে পড়েছে।

লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলতেই দেখি বারো তেরো বছরের একটি ছেলে, হাতে চায়ের কাপ। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললো, মা, চা খাবে তো।

ছেলেটিকে দেখে বালার কথা মনে পড়ে গেল আমার। গতবার এখানে এসে বালাকে এই হোটেলে পেয়েছিলাম বয় হিসেবে। সেও এভাবে সাতসকালে চা নিয়ে এসে দরজায় নক করে আমাদের ঘুম ভাঙাতো।

চা হাতে নিতে নিতে ছেলেটিকে বললাম, এখানে বালা নামে একটি ছেলে ছিল, সে কোথায়?

আমার কথায় ছেলেটি আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, বালা তো নেই, আপনি জানেন না? ওকে তো সুনামি নিয়ে গেছে।

সুনামি? আমি আতকে উঠলাম।

হ্যা, সুনামি। সুনামি ওকে সাগরে নিয়ে গেছে।

সুনামি কাকে বলে এর আগে জানতাম না। পরে যখন এর মানে জানলাম এবং মাত্র গতকাল ভোরবেলায় এর রাক্ষুসে ছোবলে আমার একজন অতি পরিচিত, অতি প্রিয়, ছেলের সমান একজনকে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে গেল তখন আমার হৃদয়টা নিদারুণ এক কষ্টের কাটার খোচায় রক্তাক্ত হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল গত বছরের দিনগুলোর কথা। এই হোটেলে আমরা পনেরো দিন ছিলাম। আমাদের সেবা করার জন্য তেরো চোদ্দ বছরের একটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে বালা নিযুক্ত ছিল। ভাষাগত কারণে তার জীবনের গল্প জানতে পারিনি। কিন্তু অনুভূতিতে সে ছিল আমার খুব স্নেহভাজন। সামান্য ইংরেজি ছাড়া সে কোনো ভাষাই বুঝতো না।

মনে পড়ে, সে রাফীর জন্য ডিম সিদ্ধ করে দিতো, দুধ গরম করে দিতো। দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে এনে দিতো। কিন্তু কিছু খেতে দিলে সে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতো।

একদিন ওকে একটি সিদ্ধ ডিম জোর করে খেতে দিলে হাতে নিতে নিতে বললো – *মাদার, আই লাভ ইউ।* বলে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে চোখের কোণে অশ্রু কণার চিকিমিকি খেলা দেখিয়ে দিল।

সেই বালা যে এভাবে হারিয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি।

মা, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

ছেলেটির কথায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

পেয়ালার চায়ে যেন বালার হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠেছে, আর বিড় বিড় করে বলছে, *মাদার আই লাভ ইউ*।

নিউ বেইলি রোড, ঢাকা থেকে

দুটি ঘটনা

– রুমা আহমেদ

এক.

চার পাচ বছর আগের ঘটনা। বাবা সরকারি চাকুরে। হঠাৎ কি কারণে চাকরি থেকে সাসপেন্ড হলেন। বাবা তো চোখে অন্ধকার দেখছেন। সংসার চলবে কি করে! ভাড়া বাসায় থাকি সব কিছু কিনে খেতে হয়। কিন্তু খাওয়া তো আর বন্ধ থাকে না। প্রচণ্ড অভাবে সংসার চলছে। নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা।

কিন্তু এদিকে আমার সকাল–সন্ধ্যা চা না হলে চলে না। কেমন যেন অলসতা ঘিরে ধরে চা না খেলে। এদিকে দুটো টিউশনি নিয়েছি কিছু আয় করে সংসারে দেবো আর কিছু চায়ের পেছনে খরচ করবো।

মা একদিন বললো, আপাতত চা খাওয়া বাদ দাও। বাড়তি টাকা খরচ হয়।

আমার ভীষণ মন খারাপ হলো। কেননা সকালবেলা এক পেয়ালা গরম চা না পান করলে আমার ঘুম ঘুম ভাব থেকে যায়।

মাকে বললাম, চায়ের খরচ আমি দেবো।

আমাদের এখন এমন অবস্থা সকালে শুধু আটার রুটি বানানো হয়। কি দিয়ে খাওয়া হবে তা জোগাড় হয় না। তাই চা একমাত্র ভরসা। চা দিয়ে রুটি ভিজিয়ে খাওয়া। তেমনি এক সকালে চা দিয়ে রুটি খাচ্ছি।

তখন মা বলছেন, বিকেলে চা পাতা, চিনি, দুধ না আনলে চা খাওয়া বন্ধ।

তখন আমার অবস্থা হলো দেখার মতো। আমি নাশতা না খেয়ে ভাবছি, আমার কাছে কয় টাকা জমানো আছে। এদিকে বাবা মাকে বলছেন আমি কাজে দূরে যাচ্ছি, আসতে দেরি হবে। ঘরে যা আছে দুপুরটা চালিয়ে দিও।

মা তখন বাবাকে বললেন, ঘরে সব বাড়ন্ত। না আনলে রান্না হবে না।

আব্বু তখন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাছে টাকা থাকলে খরচ করো। পরে দিয়ে দেবো।

এদিকে আমার অবস্থা উভয় সংকটে। চাল, ডাল আনলে চায়ের সরঞ্জাম আনা যাবে না।

গোসল সেরে টিউশনি করি যেই বাসায় সেই বাসায় চলে যাই। ছাত্রের মায়ের কাছে টাকা চাইতে লজ্জা করলো। পরে বাসায় এসে দেখি আব্বু ফেরেননি। ছোট ভাইটা শুয়ে আছে, মা বসে আছেন। মা আমাকে দেখে বললেন, কি রে টাকা আছে, কিছু এনে দিবি?

সোজা বললাম, টাকা নেই।

এমনি করে সময় গড়িয়ে বিকেল হলো, আব্বু ফেরেননি। ক্ষিধেয় পেট চো চো করছে। আমার জমানো টাকা বের করে দেখি একুশ টাকা আছে। দোকানে গিয়ে চা পাতা, চিনি, দুধ কিনে দেখি আরো চার টাকা আছে। সে টাকায় আটা কিনে আনি। মায়ের হাতে দিয়ে বললাম, নাও।

মা তখন বললেন, টাকা পেলি কোথায়?

নির্জলা মিথ্যা বললাম বাকিতে এনেছি।

রুটি, চা বানাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মা, ছোট ভাই আর আমি চা দিয়ে ভিজিয়ে রুটি খেয়েছিলাম। মা আর ছোট ভাইয়ের তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। হয়তো বা সেদিন সন্ধ্যায় কয়েক ফোটা চোখের জল চায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

এখন আমাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। কিন্তু সেদিনের কথা মনে এলে এখনো কষ্টে চোখে জল আসে। কেননা সেদিন চা না এনে চাল ডাল ঠিক আনা যেতো। তাহলে আর মা, ছোট ভাই, আমি ক্ষিধেয় কষ্ট পেতাম না।

দুই.

এই কয়েকদিন আগে আমার পক্স উঠেছে। একদিকে প্রচণ্ড গরম, অন্যদিকে পক্সের যন্ত্রণা। এদিকে নানান নিয়ম–কানুন। মা, বাবা চিন্তা করছেন মুখে না আবার দাগ বসে যায়। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম খাওয়া বন্ধ। শুধু ভর্তা, করল্লা ভাজি, ফল ও ডাব কেটে খাওয়াচ্ছেন।

আমি আছি মহা চিন্তার মধ্যে। আমাকে চা দেয়া হবে না। যেহেতু চা গরম, তাই। দুধ থাকবে সঙ্গে। সুতরাং দাগ বসে যাবে।

কিন্তু আমি বলে দিলাম, আমাকে দুবেলা যদি চা না দেয়া হয় তাহলে কোনো নিয়ম করবো না। এদিকে প্রতিবেশীরা বলে যাচ্ছে অনেক নিয়ম–কানুন।

নানু এসে বলে যাচ্ছেন, ঠাণ্ডা জিনিস খেতে, চা নিষেধ। আমি শুনিনি। সব নিয়ম মেনে চলেছি। কিন্তু চা দুবেলা খেয়েছি।

সবাই যখন গরমে হাপিয়ে ওঠে শরবত খায়, আমি তখন এক পেয়ালা গরম চা নিয়ে বসি। সে যে কি এক তৃপ্তি তা শুধু যারা চা পান করে তারাই বোঝে।

অনেকেই বলে আমাকে, তুমি এতো চা পছন্দ করো, তোমার স্বামী দেখো চা পছন্দ করবে না।

এখন খুব ভয়ে আছি। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন স্বামীকে নিয়ে বিকেলের অবসর মুহূর্তগুলো পার করবো, সঙ্গে থাকবে দুজনার প্রিয় চা।

পাঠক–পাঠিকারা আমার জন্য দোয়া করবেন, চা পান করতে পছন্দ করে এমন একজন সঙ্গী যেন পাই।

ময়মনসিংহ থেকে

পাওনা

– মোহাম্মদ লালন

আমার বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় ছয় মাস। আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর নাম ইতি। আমার চা খাওয়াটা নেশার মতো। দিনে দুই তিনবার চা না খেলে মনে হয়, কি কাজ করিনি।

আমার স্ত্রী যখন রাগ করে তখন আমার খুব ভালো লাগে। কোনোদিন সকালে সে চা বানায়। আবার কোনোদিন আমি বানাই।

আমার স্ত্রী চেষ্টা করে আমি যেন চা খাওয়া কমিয়ে দিই।

এই চা খাওয়া নিয়ে আমার এক মজার ঘটনা আছে। একদিন আমার স্ত্রীকে এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো বলেছিলাম। বাইরে থেকে আসবো আর তাকে নিয়ে আবার বের হবো।

সেদিন আমার শরীর একটু খারাপ ছিল। বাইরে থেকে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি। তাকে বলি, আজ আর বের হতে পারবো না।

সে খুব সুন্দর করে সেজেছিল।

তাকে বলি এক কাপ চা দিতে।

এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে খুব রেগে যায়। সে খুব জোরে বলে, চা দিতে পারবো না।

পাকের ঘরে কিছু না খুজে পেয়ে দুই তিনটা চায়ের কাপ ভেঙে ফেলি।

ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, আমাকে এখন ভালো লাগবে কেন, এখন তো অফিসের ম্যাডামদের সঙ্গে থাকো কাজ করো, তাদের সঙ্গে দুপুরে খাবার খাও।

এসব শুনে আমার রাগ বেড়ে যায়। তার সামনে গিয়ে তাকে এক থাপ্পড় মেরে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিই।

সঙ্গে সঙ্গে সে আরো রেগে যায়। এবং বলে, আমি এখন বাপের বাড়ি চলে যাবো। বাপের বাড়ি আমার কোনো অভাব নেই। ব্যাগ গোছাচ্ছে আর এসব বলছে।

তারপর যখন ব্যাগ নিয়ে দরজার সামনে যায় তখন তাকে জোর করে বলি, দাড়াও।

সে দাড়িয়ে যায়। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে আরো সুন্দর লাগছে।

তাকে বলি, বিয়ের সময় তোমার বাপের কাছ থেকে কোনো যৌতুক নিইনি। সুতরাং আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নেই। বরং তোমার কাছে পাওনা আছে। আমার পাওনা মিটিয়ে দাও।

সে কোনো সংকোচ না করে বলে, বলো তোমার পাওনা, এখনি মিটিয়ে দেবো।

তারপর বলি, কোনো কিছু না বলে শুধু দেখে যাও। তারপর আমার হাত দুটো তার দুই গালে ধরে সামনে এনে তার গোলাপি ঠোটে চুমু দিতে থাকি। চুমোয় চুমোয় দুজন তখন অন্য জগতে হারিয়ে যাই। তার ব্যাগটি কোথায় চলে যায় জানা নেই।

কিছুক্ষণ পরে বলি, বাপের বাড়ি যাবে না!

সে আমার বুকের মাঝে লুকিয়ে বলে আজ আর যাবো না। অন্যদিন ঠিক চলে যাবো।

মাইজদী, নোয়াখালী থেকে

সুখী দোকানদার

- এম বরকতুল্লাহ ভুলু

সবশেষে সিদ্ধান্ত চায়ের ব্যবসা অর্থাৎ চায়ের দোকান। শেষ পর্যন্ত অবলম্বন হবে এই চা। বাড়িতে সিদ্ধান্ত জানালাম।

মা মুখ খুলে কিছু না বললেও মুখে আচল ঢেকে দুই এক ফোটা চোখের পানি যে ফেলেননি তা উপলব্ধি করার মতো বোধ আমার আছে। বাবার রেখে যাওয়া শেষ অবলম্বন হাতে নিয়ে আমিও শিশুর মতো কাদলাম।

মমতাময়ী মা আশির্বাদের হাত বোলাচ্ছেন আমার ওপর। মাথায় হাত রেখে মা নিজেও হু হু করে কেদে উঠলেন।

এখন কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? নিজেই শক্ত হলাম। বললাম, তুমি কাদছো কেন মা? আমি তো আছি।

কিন্তু নিজেকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারিনি আবার কান্না শুরু করলাম।

জুলাই মাসের কোনো একদিন সকাল থেকে মা সারাক্ষণ কাদছেন। কিন্তু মায়ের তো আজ খুশি হওয়ার কথা। আজকে তো এ সংসারের একটা অবলম্বন হতে যাচ্ছে। বাবা মারা যাওয়ার পরও মাকে এতোখানি কাদতে দেখিনি। তার চোখে দেখিনি এতোটুকু বিষণ্নতা। তবে কি এমন চিঠি লিখেছেন ভাইয়া যার জন্য মা বাধ্য হলেন বংশ মর্যাদা, ঐতিহ্য, সুনাম সব ফেলে আমাকে চায়ের দোকান দিতে বলতে।

ভাইয়ার সেই চিঠিটা পড়তে চেয়েছিলাম। মা দেননি। ছোট বোনের কাছে চিঠির কথা জানতে চাইলাম, সেও নীরব।

ভাবী তার বাপের বাড়ি চলে গেছেন আজ দুই মাস। ভাইয়ার টাকা দেয়া বন্ধ। কলেজের পাট চুকিয়ে বেকার আমি। বড় ভাইয়ের দেয়া টাকা এবং ভাইয়ার পাঠানো ভিসায় বিদেশ যাবো এই আশায় ছিলাম এতো দিন।

বিষণ্ন মুখে মায়ের সামনে দাড়ালাম, মা... একটু থেকে আবার ডাকলাম মা ...। কোনো জবাব না পেয়ে বললাম, মা আমি তো আজ বাজারে যাবো দোকান চালু করবো, আজ তো তোমার খুশির দিন। কিন্তু আজ সারা দিন তুমি কাদছো।

আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক দোয়া করলেন, অতঃপর তার আগলে রাখা শেষ অবলম্বন আমার হাতে তুলে দিলেন।

বাজারে গিয়ে কিছু মুদি মালামাল, বিস্কিট, সঙ্গে চা বিক্রির যাবতীয় সরঞ্জামসহ চাপাতা। দোকান শুরু হওয়ার তিন চার দিন পরই আমার হাতে বানানো চায়ের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। অবিশ্বাস্যভাবে দোকানের বেচা-কেনা বেড়ে গেল। দূর-দূরান্ত থেকে লোক এখানে আসতো চা খেতে। দুপুরের দিকে যদিও চা বিক্রির চাপ একটু কম ছিল তবুও সকালসন্ধ্যা এ দুই সময় চা বানাতে হিমশিম খেয়ে যেতাম। এই সময় আমাকে সাহায্য করতো আমার চাচাতো ভাই।

এক বছরে খুব উন্নতি করলাম।

এরই মাঝে আরো কিছু নতুন ব্যবসা শুরু করলাম। সব কয়টিতেই সাফল্যের মুখ দেখতে পেলাম। এক সময় চিন্তা করলাম চায়ের ব্যবসা ছেড়ে দেবো। পরিচিত দুই একজনকে জানালাম।

সবাই না করলো।

তাদেরকে উপেক্ষা করে দোকানে বিজ্ঞপ্তি ঝোলালাম, *আগামীকাল থেকে চা বিক্রি বন্ধ।*

সকালে চাচাতো ভাইকে দোকানে রেখে বাড়িতে গেলাম নাশতা খেতে। এসে দেখি হুলুস্থুল কাণ্ড। সবার একই কথা, চা বিক্রি বন্ধ করা যাবে না।

এখানে তো আরো দোকান আছে, আপনাদের কোনো সমস্য হবে না।

কিন্তু কেউ শুনতে চায় না আমার কথা। সবার দাবি, চা বিক্রি বন্ধ করা চলবে না।

শুরু হলো ছোটখাটো এক আন্দোলন। কিন্তু সবাইকে হতবাক করে এক বৃদ্ধ চাচা কেদে উঠলেন।

সবার দৃষ্টি যখন তার দিকে, তিনি ভাঙা গলায় যা বললেন তার অর্থ হলো এই, বাবা, তোমার চায়ে কি জাদু আছে জানি না। প্রতিদিন প্রায় এক মাইল দূর থেকে চা খেতে এখানে আসি। আমার অনুরোধ, তুমি চা বিক্রি বন্ধ করো না।

চাচার কথা শুনে আমারও প্রায় কান্না এসে গেল। বিস্মিত হলাম মানুষের ভালোবাসা দেখে।

আজ আমার কোনো কিছুরই অভাব নেই। অর্থ, খ্যাতি, গাড়ি, বাড়ি, সবই আছে আমার। কিছু জিনিস ত্যাগ করলেও একটি জিনিস ত্যাগ করতে পারিনি তা হলো, ছোট্ট সেই চায়ের দোকানটা। যদিও দোকানটা পরিচালনা করে আমার এক চাচাতো ভাই।

প্রতি মাসেই সে বলে দোকানে নাকি লস হয়। মাঝে মধ্যে সে ছেড়ে দেয়ার জন্য বলে।

কিন্তু আমি যে ভর্তুকি দিয়ে তৃপ্তি পাই তা তাকে বলতে পারি না।

ঈদ উপলক্ষে যখন বাড়ি যাই, সন্ধ্যার দিকে দোকানে বসে নিজ হাতে চা তৈরি করে যখন প্রতিবেশীদের হাতে তুলে দিই, তাদের পরিতৃপ্ত মুখ দেখে মনে হয় আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী চায়ের দোকানদার।

কাটাবন, ঢাকা থেকে

ভোট

- বিভা চৌধুরী

আমি দেখেছি, গ্রামের রাজনীতিতে চা অপরিসীম ভূমিকা রাখে। আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পলিটিক্স করেন অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হন। তাই প্রতি পাচ বছর পর যখন নির্বাচন হয় তখন শত ব্যস্তার মাঝেও সেখানে উপস্থিত থাকি।

গ্রামের সহজ সরল মানুষ, স্বার্থপরতার বালাই নেই। তাদের যতো চা খাওয়ানো যাবে ততো তারা খুশি হবে এবং ভোট দেবে। আজকাল অবশ্য গ্রামের মানুষেরা অনেক সচেতন। চা ছাড়াও কিছু অনুদান আশা করে। তারপরও বড় বড় হাড়িতে চায়ের শ্রাদ্ধ থেকেই যায়, সঙ্গে তো বিস্কিট আছেই।

একদিন সেই আত্মীয়ের বাড়িতে রাতে ঘুমাই। সাড়া জাগানো স্লোগান শুনে রাত দুইটায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। স্লোগানগুলো এ রকম –

চা যদি খাওয়ান এখন

ভোট দেবো যখন–তখন

চা দেন বেশি করে

ভোট দেবো না দেরি করে।

অমুক ভাই কেমন লোক

বেশ বেশ ভালো লোক।

ইত্যাদি।

দেখলাম, স্লোগানগুলোতে আন্তরিকতার পরশ আছে। সুর তুলে স্লোগান ভালোই লাগছে। শীতের দিনের এ নির্বাচনের সময় এই সুর–স্লোগান তারা চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে শুরু করে। কড়া শীতের মধ্যে চা খাওয়ার হিড়িক, হাসি–তামাশা আবার প্রার্থীকে নিয়ে নানান সুরে সুন্দর করে গান সাজানো বা গান গাওয়া। আমার খুব ভালো লাগলো। খুবই উপভোগ করলাম। নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। নির্বাচন এলে গ্রামের মানুষ খুব মজা করে।

তারপর সেখানটায় আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। এক ভোটার তার ছেলেকে নিয়ে প্রার্থীর বাড়ি এসে চা খাচ্ছেন। ছেলেটির বয়স আট নয় বছর বয়স হতে পারে। সে এক কাপ করে চা নিচ্ছে আর ফেলছে। একবার এক কাপ নিচ্ছে আবার ফেলছে।

আমার মনে হলো ছেলেটি অবুঝ হলেও অন্তত এটুকু বোঝে যে, চাগুলো সে নষ্ট করছে।

কেউ কিছু বলছে না। ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে।

অবাক হয়ে খালাম্মাকে বললাম, খালাম্মা, বাচ্চাটা চাগুলো নষ্ট করছে, আপনারা কেউ কিছু বলছেন না। কিন্তু কেন?

তিনি উত্তর দিলেন, এটা বললে তার ভোট দেবে না। রাগ করে চলে যাবে।

বুঝলাম মানুষ, বিশেষ করে যারা পাবলিক পলিটিক্স করে বা যারা প্রার্থী পক্ষের কিংবা বাড়ির তারা একটা ভোটের জন্য কতো অসহায় হয়ে যায়।

এ রকম আরো দুই একটা ঘটনা দেখলাম যাতে তাদের অসহায়ত্ব আরো ফুটে উঠলো। এতে আমার কষ্ট হলো। তবে যেটাই হোক, এই চা যে কতো ফলদায়ক তা নির্বাচন শেষে বোঝা গেল। শুধু এক কাপ করে চা একটা সম্মানজনক নেতৃত্ব উপহার দিয়ে বিদায় নিল। নির্দিষ্ট দিনে ভোট হয়ে গেল।

বগুড়া থেকে

গোস্বা হবে শীতল

- নিজাম আহমেদ

আমাদের বাড়ির পাশে শান্তির হাটে রহিমউল্লাহ সওদাগরের চায়ের দোকানের কথা মীরসরাই উপজেলার এলাকাবাসী এক নামে চেনে। এই বাজারে আরো চায়ের দোকান আছে। কিন্তু সবাই রহিমউল্লাহ সওদাগরের চায়ের দোকানে ভিড় জমায়।

শৈশবে আমরা ফুটবল খেলা শেষে সবাই এই দোকানে চা খেতে আসতাম। চায়ের সঙ্গে থাকতো বান অথবা লোফ (Loaf)। চায়ের কাপে বান ভিজিয়ে খাওয়াটার যে কি স্বাদ তা বলার মতো নয়। অর্ধেক বান খাওয়া হলে চা শেষ হয়ে যেতো। পুনরায় হোটেল বয় মহিউদ্দিনকে বলতাম, ভাগিনা, একটু চায়ের ঝোল দাও।

পরক্ষণেই মহিউদ্দিন এসে রেডিমেড চায়ের পাতিল থেকে আমাদের খালি কাপ ভরে দিতো।

হোটেল মালিক রহিমউল্লাহ সওদাগর ক্যাশ বাক্সের পাশে বসে আড় নয়নে আমাদের বাড়াবাড়িটা খেয়াল করতেন। কিছুই বলতেন না। কারণ আমাদেরকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। অনেক বছর হলো তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন।

এখন ওনার ছেলেরা এই চায়ের দোকানের দেখভাল করেন। আগের মতো সেই হাক-ডাক এখন আর নেই। কারণ হাইরোড হওয়াতে সবাই বারৈয়া হাটের দিকে ছোটেন।

শান্তির হাটের আরেক চায়ের দোকান *ভূঞার রঙ চা*-এর দোকান। এখানে শুধু উন্নতমানের রঙ চা বিক্রি হতো। হাল আমলে দুধ চাও পাওয়া যায়। সেই ছোটবেলায় দেখতাম, তারাবিহ নামাজ শেষে মুরুব্বিগোছের লোকেরা হাতে হারিকেন নিয়ে ভূঞার চায়ের দোকানে হাজির হতেন।

বাকি কাস্টমার দেখলে ভূঞা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। অনেকে চা নাশতা খেয়ে ক্যাশে বসা ভূঞার সামনে এসে আকুতি-মিনতি করতেন পয়সা পরে দেয়ার জন্য। তখন রাগান্বিত হয়ে ভূঞা বলতেন, *আমনে আর জানের জান পয়সাগুলো দিয়ে যান। নইলে পেছনের দরজা খোলা আছে সেই খান দিয়ে চলে যান।*

ভূঞা রঙ চায়ের দোকানের মালিক ফজলুল হক ভূঞা একবার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মেম্বার পদে প্রার্থী হয়েছিলেন। ভোটের দুই সপ্তাহ আগে থেকে নিজ এলাকার ভোটারদের জন্য চা ফৃ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু

বিধি বাম। ভূঞা পরাজিত হয়ে বলেছিলেন, *হারামিরা আর চা খাই আরে ভোট দে নাই। আর লগে বেইমানি কইছ্ছে। আল্লাহয় হেতারগো বিচার কইরবো।*

পরিশেষে ইনডিয়ান চায়ের কথা না বললেই নয়। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং নেয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের অম্পিনগরে লাগাতার দেড় মাস ছিলাম। প্রতিদিন সকালবেলা বড় এক মগ রঙ চা খেতাম। চায়ের পাতাগুলো এতোই বড় ছিল যে, হাতে গোনা যেতো। সেই চায়ের সঙ্গে গরম পরটার মজাটাই ছিল আলাদা।

এখন প্রবাস থেকে ছুটিতে বাড়ি এলে আমার স্ত্রী নিজ হাতে ঘন করে দুধ চা বানিয়ে আমার নির্দিষ্ট বড় কাপে পরিবেশন করে। এই লেখা যখন যাযাদিনে ছাপা হবে তখন আমার স্ত্রীর গোস্বা কিছুটা হলেও শীতল হবে।

উল্লেখ্য যে, গত ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা সংখ্যায় *মা* শিরোনামে আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল। তাতে মুরগির মাথা নিয়ে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলাম, *মুরগির মাথা আমার পাতে জোটে না। মুরগি রান্না হলেই আগেভাগেই সালমার মা (আমার স্ত্রী) মুরগির মাথাটা গলাধঃকরণ করে...।* এই লেখা ছাপা হলে কয়েকদিন পরেই বাড়ি থেকে স্ত্রীর ফোন এলো। বললো, যাযাদি-তে আমার বদনামি কেন তুলে ধরেছো। ঠিক আছে, এখন থেকে বাড়িতে মুরগি রান্না হলে প্রতিটা মুরগির মাথা তোমার জন্য ফৃজে তুলে রাখবো। তুমি বাড়ি এলে সব কয়টা মাথা এক সঙ্গে রান্না করে দেবো। তোমাকেই খেতে হবে।

ইনশাআল্লাহ, আর কয়টা মাস পর বাড়িতে যাবো। কাজেই এখন থেকে কিছুটা হলেও স্ত্রীর প্রশংসা তুলে ধরতে হয়।

হয়তো ঘন দুধের চায়ের আড়ালে মুরগির মাথা হারিয়ে যাবে।

শারজাহ, ইউএই থেকে

বহু মত

– মোহাম্মদ ইসমাইল শাকিল

চায়ের মধ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদানটি হৃদরোগের জন্য দায়ী খারাপ কোলেস্টরলকে ধমনীর গায়ে জমাট বাধতে দেয় না। ফলে ধমনী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায় এবং হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারেও এই অ্যান্টি অক্সিডেন্টের প্রতিরোধী ভূমিকা রয়েছে। এরা দেহকোষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

কিন্তু দুধের সংমিশ্রণে এই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। দুধের মধ্যে যে প্রোটিন আছে তা অ্যান্টি অক্সিডেন্টের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ভিন্ন একটি যৌগ গঠন করে এবং শরীর সেটা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপস্থিত থেকেও তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং সকলে দুধ মিশ্রিত চা পরিহার করে রঙ চা পান করুন, সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকুন।

নিচে চা পান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা উল্লেখ করলাম।

যেহেতু আমি একজন কলেজ শিক্ষক (প্রভাষক, পরিসংখ্যান), তাই চা পান সংক্রান্ত ঘটনাগুলো আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক –

গত জানুয়ারি মাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক মকবুল স্যার গেস্ট হিসেবে কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। স্যারকে চা অফার করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, চা পান করতে পারি এক শর্তে যদি তা রঙ চা হয়। তার দৃষ্টিতে কনডেন্সড মিল্ক আসলে কোনো মিল্ক নয়। এর মধ্যে দুধের কোনো নিশানা পর্যন্ত নেই। তাই তিনি এই চা পরিহার করে আমাকে সব সময় গরুর দুধ দিয়ে তৈরি চা অথবা রঙ চা পান করার উপদেশ দেন।

আমাদের কলেজের হিসাববিজ্ঞানের প্রভাষক মোতাসিম বিল্লাহ মহিম যদি দিনে মাত্র এক চা পান করেন তাহলে ওই রাতে তার ঘুম আসে না। তাই তিনি চা পান করা থেকে সর্বদা বিরত থাকেন।

যুক্তিবিদ্যার প্রভাষক দেলোয়ার হোসেন সব সময় এক টানে এক কাপ চা খেয়ে ফেলেন। তার দৃষ্টিতে এই উপায়ে চা খেলে নাকি চা খাওয়ার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়।

তবে তার চা খাওয়ার এই পদ্ধতি দেখে অর্থনীতির প্রভাষক মহসিন মিঞা বলেন, এতে করে তার (দেলোয়ার) জিভ ও লাংসের ক্ষতি হতে পারে।

দেলোয়ারের অন্য যুক্তি হলো, রাগের সময় দুই কাপ চা পান করতে হয়। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি রাগ প্রশমিত হয়।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাষক সাইফুল ইসলামের চা সম্পর্কে থিওরি হলো, আমি ওষুধ হিসেবে চা খাই না। তাই সব সময় দুধ চা খাই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক মাজহারুল ইসলামের কথা হলো, রঙ চা অথবা দুধ চা একটা হলেই চলে। তবে সময় মতো চা পান করতে না পারলে মাথা ঠিক থাকে না।

আমাদের কলেজের ম্যাডামরা কলেজে চা পান করেন না। তবে *মোহাম্মদীয়া* হোটেলের চা হলে (স্থানীয় একটি হোটেল) ওনারা তা সাদরেই পান করেন।

অনুরোধ : আমার প্রিয় ছাত্রীদের মধ্যে একজন আমাকে ক্লাসের ফাকে বললো – স্যার, আপনি নাকি খুব বেশি চা পান করেন। বেশি চা পান করলে মানুষ কালো হয়ে যায়। তাই আপনাকে অনুরোধ, বেশি চা পান করবেন না।

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে

অপূর্ণতা

– আলতাফ হোসেন লাভলু

তখন আমি ছোট্ট ছিলাম, সবেমাত্র বর্ণমালার হাতে খড়ি চলছে আমার জীবনে, বাবার কাছেই লেখাপড়ার প্রথম তালিম নিয়েছিলাম। বাবা সরকারি চাকরি স্বেচ্ছায় ছেড়ে মানুষ গড়ার কারিগর হয়েছিলেন গ্রামে স্কুল গড়ে। কলকাতার চাকরি ইস্তফা দিয়ে শিক্ষকতা পেশাকে বরণ করে নিয়েছিলেন গ্রামের অন্ধকার মানুষগুলোকে আলোকিত মানুষ গড়ার নিজের কমিটমেন্ট থেকে।

এ সুবাদে আমরাও অনেক ভাইবোন গ্রামে এসে বাবার কাছেই লেখাপড়া শিখেছি। শহর থেকে গ্রামে এসে প্রথমে আমাদের অসুবিধা হলেও মা বাবার সঙ্গে আমরাও মেনে নিয়েছিলাম। আমাদের গ্রামের বাড়ির নাম দিয়েছিলেন *শান্ত নীড়*।

শিক্ষা ও আতিথেয়তায় বাবা ছিলেন উদার। তার ছিল সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ রুচি বোধ। এই বোধ থেকে অতিথি আপ্যায়নের জন্য বাবা কলকাতা থেকে সিরামিকের সুন্দর টিসেট এনেছিলেন।

একদিন শান্ত নীড়ে আপাকে দেখতে আসেন বরের সঙ্গে তার বড় দুলাভাই (সাবেক এমপি)সহ আরো কয়েকজন। একটি ঘরে বসে আছেন অতিথিরা।

অভিভাবকের কথা মতো আমাদের এই টিসেটে চা নিয়ে পর্দা ঠেলে ঢোকেন আপা। ধোয়া ওঠা চা কাপে ঢেলে অতিথিদের দেন। অতিথিদের মধ্যে বরের দুলাভাই, আমার বাবাকে বলেছিলেন, গ্রামের বাড়িতে যে পরিবারে এতো সুন্দর একটি টিসেট থাকতে পারে সে পরিবার আর তার মেয়েকে কি আমরা অপছন্দ করতে পারি? চা পান করে বাবাকে বলেছিলেন বিয়ের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা করতে।

আপার বিয়ে হয়েছিল চাপ্রিয় এ দুলাভাইয়ের সঙ্গে আর দুলাভাইয়ের দুলাভাইও ছিলেন বিচক্ষণ চা প্রিয় ভদ্র মানুষ। চা নিয়ে কতো ঠাট্টা, মজা করি প্রিয় এই মানুষটার সঙ্গে!

অতিথি আপ্যায়নে আমাদের পরিবারে চা পরিবেশনের একটা কালচার গড়ে উঠেছিল গ্রামের এই শান্ত নীড়ে। চায়ের সঙ্গে নেহায়েত চিড়া ভাজি, মুড়ি বা টোস্ট বিস্কিট অন্তত হাসি মুখে মা অতিথিদের সামনে দিতেন। আম্মা কখনো সংসারের অভাব–অনটন কাউকে বুঝতে দিতেন না।

আব্বার চায়ের কাপটি একদিন ভেঙে যাওয়ায় এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন আম্মা। সংসারে দারিদ্রের মাঝেও আম্মা কষ্ট করে, বাজারের টাকা সঞ্চয় করে বাবাকে একটি সুন্দর পাঞ্জাবি ও আকর্ষণীয় একটি চায়ের মগ কিনে দিয়েছিলেন।

ডায়াবেটিসের কারণে বাবা রঙ চা চিনি ছাড়া খেতেন।

সোমবার স্কুলে থেকে এসে বিকেলবেলা বাবা মোটা ফ্রেমের চশমার সঙ্গে নতুন পাঞ্জাবি পরে এই টিপটে করে চা খাচ্ছেন আর আমাদের পড়াচ্ছেন A–তে Ant. Ant মানে পিপড়া। B–তে Book. Book মানে বই। C-তে Cat. Cat মানে বিড়াল।

এভাবে প্রতিদিন নতুন নতুন অক্ষর দিয়ে এক একটি শব্দের সঙ্গে আমি পরিচিত হচ্ছিলাম।

বাবা মনোযোগ সহকারে আবার টি পটে চুমুক দিয়ে কি যেন ভাবছিলেন।

পড়তে গিয়ে T অক্ষরটি পেয়ে অমনি কৌতূহলী মনে প্রশ্ন করেছিলাম T–তে কি বাবা?

আনমনে বলেছিলেন T–তে Tea, Tea মানে চা।

অমনি আমার প্রশ্নের পর প্রশ্ন? চা কোথায় পাওয়া যায়, কিভাবে হয়, কিভাবে তৈরি করা হয় – এমন হাজারও প্রশ্ন। বাবা বিরক্ত হচ্ছেন তা না বুঝেই আমি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তার পাঞ্জাবির পকেট ধরে টান দেয়ায়, অমনি কাপটি ভেঙে চা পড়ে শাদা ধবধবে পাঞ্জাবিটি কফি কালার হয়ে গেল।

ঘুরেই ক্ষিপ্ত হয়ে বাবা আমাকে চড় মারেন।

কান্নায় ভেঙে পড়ি। হতবাক হয়ে অভিমানে কথা বলিনি তার সঙ্গে।

বাবা হঠাৎ চটে যেতেন। কিছু সময় পর বাবা এসে আমাকে সহজ করার জন্য আদর করেছেন।

আমি কোনো কথাই বলিনি।

পরে বাবা কলকাতার চা বাগানের গল্প বলেছিলেন।

তারপরও কিছুতেই কথা বলিনি কেন জানি। মন খারাপ করে ভেবেছি, বড় হয়ে নিজের রোজগারে এর চেয়ে অনেক সুন্দর চায়ের কাপ, পাঞ্জাবি কিনে দেবো। বলবো, বাবা, এটা তোমার জন্য।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমার, তার কয়দিন পর বাবা হঠাৎ করে মারা যান। তার প্রাণহীন দেহ এই চা পাতা ছড়িয়ে ঢেকে রেখেছে। তিনি এতো দ্রুত এ ভুবন থেকে বিদায় নেবেন আমি কি তা জানতাম!

বর্তমানে লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছি। সরকারি চাকরিও করছি। চাইলে আগের চেয়ে সুন্দর চায়ের কাপ ও পাঞ্জাবি এখন কিনতেও পারি। কিন্তু সেদিনের টিপট আর পাঞ্জাবির মধ্যে যে মমতা আর ভালোবাসা জড়িয়েছিল তার মতো কখনোই হবে না।

ছোটবেলার কচি মনের সেই স্বপ্ন আজ সত্যি হয়েছে। কিন্তু বাবা তো দেখে যেতে পারলেন না! এই অপূর্ণতা আমার মধ্যে, বাবার সঙ্গে অনুরাগে কথা না বলার সেই অপরাধ বোধ আজ আমাকে পীড়া দেয়। এ জন্য চা পান করা থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বিরত রাখি।

চিনাধুকুড়িয়া, সিরাজগঞ্জ থেকে

খুলনার সকাল- সন্ধ্যা

- বাবু

চায়ের অভ্যাস আমার কখনোই ছিল না। আমাদের পরিবারের কারোরই তেমন চায়ের অভ্যাস নেই।

ছোটবেলা দেখতাম সন্ধ্যার সময় গ্রামের লোকজন আব্বার কাছে বিভিন্ন কাজে এলে শুধু তখনই চায়ের আয়োজন করা হতো। অন্য সময় চায়ের কোনো খোজ থাকতো না। স্কুলের পাট চুকিয়ে কলেজে পড়ার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে এলাকার বিভিন্ন সংগঠন এবং কলেজে মাঝে মধ্যে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে চা খাওয়া হতো। এবং জগাবাবুর ক্যাম্পাসে (জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পাস) কম দামের চা ছিল আমাদের আড্ডার অতিথি আপ্যায়নের প্রধান মেনু। চায়ের আরো অন্য টুকরো ঘটনার মধ্যে খুলনার *সকাল–সন্ধ্যা* চায়ের কথা আজো মনে পড়ে।

২০০৩ সালে *ইউনিসেফ*–এর একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক জরিপের কাজে মোট ছয়টি টিমের মধ্যে আমাদের টিমকে পাঠানো হয় খুলনায়। প্রথমে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার দুইটি ইউনিয়নে কাজ করার পর খুলনা শহরে কাজ করতে বলা হয়। আমাদের টিমের সদস্য সংখ্যা ছিল ছয় জন। তার মধ্যে দুজন খুলনার স্থানীয় বাসিন্দা, একজন বরিশালের আর বাকি আমরা তিনজন ঢাকার।

খুলনার দুজন থাকায় সে এলাকায় আমাদের কাজ করতে অনেক সুবিধা হয়েছিল। খুলনার বাসিন্দা দুজনের নাম ছিল মাহবুব ও ইলিয়াস।

খুলনা শহরে কাজ করার সময় একদিন মাহবুবভাই বললেন, বাবুভাই, খুলনার বিখ্যাত *সকাল–সন্ধ্যা* চা খাওয়াতে নিয়ে যাবো আপনাদের।

তার কথা মতো একদিন বিকেলের দিকে শহরের কোর্ট–কাচারি এলাকায় গেলাম সেই বিখ্যাত চা খাওয়ার উদ্দেশ্যে।

গিয়ে তো আমি অবাক। চা খেতেও সিরিয়াল ধরতে হয় তা প্রথম দেখলাম। ফুটপাথের ওপর এক যুবক চা বিক্রি করছে। ফুটপাথে হলেও বেশ পরিষ্কার। এমনিতেও খুলনা শহর ঢাকার তুলনায় পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। এক কাপ চায়ের দাম পাচ টাকা এবং তিন টাকা। অবশ্য কাপ বলা যায় না। কারণ সেখানে কাচের গ্লাস এবং মগে করে চা বিক্রি হয়।

যাই হোক। অবশেষে এলো সকাল–সন্ধ্যা চা পান করার সময়। আমরা ঢাকার মানুষ বলে একটু স্পেশালভাবে মগে করে দেয়া হলো আমাদের চা। সকাল–সন্ধ্যা চা–কে লাল চা বলা যায়। তবে এর বিশেষত্ব হচ্ছে, দুই রকম কালার থাকে খাওয়া শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রথমে চিনি মিশ্রিত পানি অর্ধেক পরিমাণে, তার ওপর চা পাতা মিশ্রিত পানি অর্ধেক।

পানিতে চিনির আধিক্য থাকায় চা পাতা মিশ্রিত রঙিন পানি সহজে নিচের পানির সঙ্গে মেশে না। তাই ওভাবেই খেয়ে শেষ করা যায় পুরো গ্লাস চা। চায়ের দুই রকম মিশ্রণের কারণেই হয়তো *সকাল–সন্ধ্যা* নাম রাখা হয়েছে।

জাপান থেকে

রেডি টি

- ইব্রাহীম বিন মালেক

ঈদের ছুটি শেষ। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় হলে ফিরছি। জার্নির সময় সাধারণত তেমন কিছু খাই না। এতে আমার আনইজি লাগে এবং মাঝে মধ্যে বমিও করি।

আম্মার বলাবলির কারণে গোশত দিয়ে ভাত খেয়ে সকালে ঘর থেকে বের হলাম।

পথে এক সময়ের স্কুল সহপাঠী বন্ধু মোর্শেদ, শওকাত, শিবলী, তৈয়বের সঙ্গে দেখা, এখন কেউ বিএ পাস, কেউ বিয়ে পাস, আর কেউ টো টো কম্পানির ম্যানেজার অর্থাৎ বেকার। বললাম, দোস্ত, চলে যাচ্ছি, দোয়া করিস, দেখা হবে।

আমাদের এলাকা থেকে একমাত্র আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ফলে সবাই আমাকে খুব আদর করে, বন্ধুরা মনে করে আমি খুব বৃলিয়ান্ট। আমিও নিজেকে মাঝে মধ্যে গাধার মতো বৃলিয়ান্ট ভাবি। একটা কার্টুন দেখেছিলাম ইউনিভার্সিটিতে মেধাবীরা ঢুকছে আর গরু-ছাগল, গাধারা বের হচ্ছে। এটার সঙ্গে আমার যে যথেষ্ট মিল আছে তা মাঝে মধ্যে টের পাই।

মোটামুটি সব বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে ভাটিয়ারিতে আসার জন্য বড়দীঘির পাড়ে জিপে উঠবো, ঠিক এ সময় অনেক দিনের পুরনো বন্ধু সুজনের সঙ্গে দেখা। সে তো একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে হায়, তুই কেমন আছিস? অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা নেই, তুই ফর্শা, মোটা হয়ে গেছিস। এই পাম্পপট্টি মার্কা কথা শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে বললো, দোস্ত, বাসায় চল।

বললাম দেখ, আমি ঢাকায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়েছি, সো এখন তোদের বাসায় যাবো না। আবার এলে না হয় যাবো।

সে বললো, ঠিক আছে, তাহলে দোকানে চল কিছু খাবি।

আমি এই মাত্র বাসা থেকে খেয়ে এসেছি, সো কিছু খাবো না।

তার পীড়াপীড়িতে দোকানে গিয়ে বসলাম।

দোস্ত, কি খাবি?

বললাম তো কিছু খাবো না। তবে এক কাপ চা চলবে।

চা মানে ইদানীং *রেডি টি* নামে এক ধরনের রঙ চা পাওয়া যায় যাতে চিনি এবং চায়ের রঙ এক সঙ্গে থাকে শুধু গরম পানি দিলেই রঙ চা হয়ে যায়। রেডি টি আবার আমার পছন্দ। কারণ এই চা পানে পেট ক্লিয়ার থাকে এবং চাঙ্গা ভাব আসে।

যাহোক, এক কাপ রেডি টি পান করে জিপে চড়ে ভাটিয়ারি এলাম ফেনীগামী গাড়ি ধরার জন্য। বলে রাখা ভালো, *হানিফ, এস আলম* ইত্যাদি চেয়ার কোচে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসতে দুইশ দশ টাকা লাগে এবং পথে খাওয়া-দাওয়াসহ মোট তিনশ টাকার মতো লাগে। টাকা বাচানোর জন্য আমি ভাটিয়ারি থেকে সোনাপুর বা ফেনীগামী বাসে ত্রিশ টাকা দিয়ে মহিপাল এবং মহিপাল থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঢাকায় আসি। অর্থাৎ আমার মোট খরচ মাত্র আশি টাকা। এটা আমার বাবার দেয়া থিওরি। আমি জাস্ট ফলো করি।

বুঝতেই পারছেন, তিনি একটু কিপ্টুস টাইপের। আমি কিপ্টুস স্কয়ার, পারলে শুধু পঞ্চাশ টাকায় ঢাকা আসার চেষ্টা করি।

সোনাপুরগামী গাড়িতে চড়লাম। গাড়ি যখন মিরসরাই এলো তখন আমার হালকা-পাতলা নিম্নচাপ শুরু হলো (টয়লেট কা মামলা) অর্থাৎ রেডি টির একশন শুরু (অল ক্লিয়ার করবে)। গাড়ি যখন বারৈয়ার হাট পৌছলো তখন আমার অবস্থা বেগতিক। ভাবলাম এখানেই নেমে পড়ি এবং কাজ সেরে নিই। গাড়ি যাকগে। কিন্তু গাড়ি ভাড়া ত্রিশ টাকা দিয়েছি এ কথা মনে পড়তেই চেপেচুপে বসে রইলাম।

বারৈয়ার হাট পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিম্নচাপ ঝড়ো বেগে আবির্ভূত হলো। এখন আর চেপেচুপেও রাখতে পারছি না। জীবনে এ প্রথম এই ধরনের কঠিন সমস্যার মুখোমুখি। বার বার আল্লাহকে ডাকছি যাতে সিটে আবার সর্বনাশ করে না দিই। কারণ পাশের সিটে এক সুন্দরী ললনা বসা ছিল। তার দিকে আড় চোখে তাকাই, সে যেন আমার এ অবস্থা বুঝতে না পারে।

এতোক্ষণ পর্যন্ত অনেক রসালো আলাপ হয়েছিল, কিন্তু এখন আমি চুপ করে থাকায় সে বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। সে চাচ্ছে আমার সঙ্গে পিরিতের আলাপ করতে। তবে আমার ওপর কি ঝড় যাচ্ছে সে তো আমিই বুঝি!

কখন মহিপাল আসবে আর আমি গাড়ি থেকে নামবো, এই চিন্তায় আমার মনে হয় কয়েক লাখবার আল্লাহকে ডেকেছি।

কারণ মহিপাল রাস্তার সঙ্গে একটা জামে মসজিদ আছে। সেখানে আগে যখন এসেছি তখন প্রস্রাব করে হাত মুখ ধুয়ে খাদেমকে এক টাকা বা দুই টাকা যখন যা থাকতো দিতাম। কখনো পায়খানা করার প্রয়োজন হয়নি। তাই ভাবলাম যেহেতু প্রস্রাবখানা আছে, তাহলে পায়খানাও থাকবে।

অবশেষে গাড়ি মহিপাল এলো। ললনাকে হালকা ধন্যবাদ দিয়ে ব্যাগ নিয়ে দ্রুত গাড়ি থেকে নামলাম। কিন্তু হায়! নেমে আর দৌড়াতে পারছি না। এ মুহূর্তে দৌড়িয়ে টয়লেটে যাওয়া ফরজ। দৌড়াতে গিয়ে দুই পা একটু ফাক হলে অবস্থা নাজুক হতে পারে ভেবে দুই পা এক সঙ্গে করে চেপেচুপে প্রাণপণে হাটতে লাগলাম। মসজিদের প্রস্রাবখানায় টয়লেট খুজতে লাগলাম। কিন্তু টয়লেট আর পেলাম না।

খাদেমের কাছে এসে বললাম, হুজুর, টয়লেট নেই?

তিনি বললেন, এখানে তো টয়লেট নেই, শুধু প্রস্রাবখানা আছে।

তাড়াতাড়ি বললাম, হুজুর, টয়লেট কোথায় আছে সেটা বলেন।

তিনি বললেন, ভাইজান, আপনি একটু পশ্চিমে যান, সেখানে পাবলিক টয়লেট আছে।

পশ্চিমে আন্দাজে হাটা শুরু করলাম। তখন পূর্ব-পশ্চিম কিছুই মাথায় আসছে না।

যাহোক, কিছু দূর গিয়ে দেখলাম দূরে একটা ভাঙা সাইনবোর্ডে পাবলিক লেখা দেখা যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম পাবলিকটাই টয়লেট।

কাছে এসে বুঝলাম এটাই টয়লেট। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা টয়লেটকিপারকে দিয়ে দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করলাম। ভাবলাম ভেতরে পানির ব্যবস্থা আছে। অন্ধকারে পানির ট্যাপ না পেয়ে খালি বদনা দেখলাম। বুঝলাম পানির ব্যবস্থা বাইরে। চেইন খোলা অবস্থায় বদনা নিয়ে বাইরে এসে পানি নিয়ে ঢুকলাম। আর কিছুক্ষণ হলে হয়তো ওই টয়লেটও অন্যের দখলে যেতো। কারণ বাইরে দেখলাম আরো দুজন ঢোকার অপেক্ষায়।

কমোডে পা দিয়ে প্যান্ট খুলতে না খুলতে সব কিছু এক সঙ্গে ছাড়লাম। আহ! কি শান্তি! কি সুখ! এ মুহূর্তে দুনিয়ার সব সম্পদ এনে দিলে বা ভোগ করলেও এতো সুখ হবে না।

সাত-পাচ ভাবতে ভাবতে একটা মহান সূত্র আবিষ্কার করলাম, ত্যাগেই সুখ, ভোগে নয়। বিজ্ঞানী হলে হয়তো *ইউরেকা, ইউরেকা* বলে প্যান্ট ছাড়াই রাস্তায় দৌড়াতাম। কিন্তু মানইজ্জতের ভয়ে তা করিনি। তবে ইউনিভার্সিটি হলে পৌছার আগ পর্যন্ত মনে মনে সূত্রটা আওড়ালাম। *ত্যাগেই সুখ ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ...।* পরে হলে এসে শুনলাম এই সূত্র নাকি অনেক আগেই আবিষ্কৃত। বুঝলাম, যে মহান বিজ্ঞানী এ মহান সূত্র আবিষ্কার করেছেন তাকে হয়তো আমার মতো *রেডি টি*-র একশনে পেয়েছিল।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

ভায়াগ্রা

– রূপা

বিয়ে হয়েছে প্রায় দেড় বছর। ছোট দুই রুমে আমার সংসার। প্রাচুর্য নেই। কিন্তু সুখ আছে। আমার মানুষটি অসম্ভব রকমের ভালো। আমাকে সে খুবই ভালো বাসে। কারণ আমি খুব ভালো চা বানাই এবং আমার হাতে চা খেলে নাকি তার সমস্ত দিন ভালো যায়।

এমনকি যখন মিলন হয় তখনো সে চা খাবে। সে বলে, চা নাকি তখন ভায়াগ্রার কাজ করে। তার কতো শক্তি তখন ভালোভাবে বোঝা যায়।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে

রহস্যময়ী

- জাকিউল আলম রওনক

ময়মনসিংহ শহরের সেনবাড়ী রোডের এই বাড়িটায় ঢাকা থেকে এসেছি বেলা বারোটার দিকে। এই বাড়িটা আমার বড় খালুর। তিনি চার দিন আগে পরলোকগমন করেছেন। আজ তার কুলখানি, সে উদ্দেশ্যেই ঢাকা থেকে এসেছি।

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার ফাকে দেখা হয়ে গেল তানিয়ার সঙ্গে যাকে একদিন আমার হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম। তানিয়ার সঙ্গে দেখা হলো প্রায় এক বছর পর। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে তার স্বভাবসুলভ হাসিমাখা মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। আমিই প্রথমে চোখ সরিয়ে নিলাম, আজ এতো দিন পরও তার দিকে তাকিয়ে কেন যেন বুকটা কেপে উঠলো।

বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে হলো না, পেছন থেকে কবিরভাইয়ের ডাক পেলাম। কবিরভাই হচ্ছে বড় খালুর ছেলে। বললেন, এতোক্ষণে আসার সময় হলো, আয় আমার সঙ্গে, একটু সাহায্য কর।

এরপর কোরআন খতম, মিলাদ মাহফিল, গরিবদের খাওয়া–দাওয়া, কুলখানিতে আগত বিভিন্ন মানুষকে আপ্যায়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সময় কেটে গেল।

বিকাল পাচটার দিকে আকাশে প্রচুর মেঘ করলো, সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। আমার ঢাকা যেতে হবে। কারণ আগামীকাল আমার একটা চাকরির ইটারভিউ আছে। যদি বৃষ্টি বা ঝড় এসে যায় তাহলে হয়তো আমার যাওয়াই হবে না। তাই সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম তাড়াতাড়ি।

তানিয়াকে আরেকবার দেখার জন্য কবিরভাইকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, এই দশ মিনিট আগে তানিয়া, তার বাবা–মা আর তাদের কাজের মেয়েটা চলে গেছে।

মনটাই খারাপ হয়ে গেল। দশ মিনিট বেশি সময় নয়, হয়তো মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে তাড়াতাড়ি গেলে ওদের পাওয়া যাবে। কারণ তারাও ঢাকা যাবে। দ্রুত রিকশা নিলাম। সঙ্গে মামাতো ভাই সুমন।

তানিয়া হচ্ছে আমার দূরসম্পর্কের খালার একমাত্র মেয়ে। বছর চারেক আগে তার সঙ্গে আমার মিষ্টি ভালোবাসার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিভাবে যে আমি এবং সে দুজনই দুজনার প্রতি দুর্বল হয়ে গেলাম কিছুই টের পাইনি।

বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু বছর খানেক পরেই যখন দুই পরিবার এ সম্পর্কে একটু জানলো। তখনই সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল। হঠাৎ করেই সে আমাকে ফোন করা, চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল।

এদিকে আমার পরিবারের সদস্যরাও আমাকে আকারে–ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, তার সঙ্গে যেন সম্পর্ক না করি।

এরপর তানিয়াকে ফোন করলে রেখে দেয়, দেখা হলে এড়িয়ে চলে। আমি রাগে-অভিমানে তার সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু তানিয়া স্পষ্ট করে কোনোদিন বলেনি, আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। কেন বলেনি সেটা আমার কাছে এখনো রহস্য।

এরই মধ্যে আমরা বাসস্ট্যান্ডে চলে এলাম। সুমনকে টিকেট করতে বলে আশপাশের বাসগুলোর দিকে এগোলাম যদি একটু দেখতে পাই। নাহ! পেলাম না।

বাসে উঠে বসলাম, কিছুক্ষণ পরই বাস ছেলে দিল। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম মাথা ব্যথা করছে। মনে পড়লো, সেই সকালে এক কাপ চা খেয়েছি, তারপর চা খাওয়ার কথা ভুলেই গেছি। অথচ আমার ঘন ঘন চা খাওয়ার অভ্যাস। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এবং রাতে বিছানায় যাবার আগে দশ বারো কাপ চা খাওয়া হয়ে যায়। এখন আরো দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ এটা ঢাকা-ময়মনসিংহ বিরতিহীন বাস, কোথাও থামবে না।

চায়ের কথায় আবারও তানিয়াকে মনে পড়লো। তানিয়াদের পরিবার ছিল খুবই রক্ষণশীল পরিবার। তার সঙ্গে আমি মাত্র একবার বাইরে বের হয়েছিলাম। বেশির ভাগ সময়ই দেখা হতো তাদের বাসায় আমি গেলে অথবা সে আমাদের বাসায় এলে। কিন্তু তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা, একটু হাতের স্পর্শ হতো না বললেই চলে। চুমু খাওয়া দূরে থাক।

একদিন ওদের বাসার ড্রয়িংরুমে বসে আমি চা খাচ্ছি আর তার সঙ্গে গল্প করছি। তার মা অর্থাৎ আমার খালা বার বার আসা-যাওয়া করছেন এই রুমে। তাই লুকিয়ে তাকে একটা চুমু খাওয়ার ইচ্ছা মনেপ্রাণে দমিয়ে রাখছি।

হঠাৎ সে আমার চায়ের কাপটা নিয়ে তাতে চুমুক দেয়া আরম্ভ করলো।

বললাম, তুমি তো আরেক কাপ চা আনলেই পারতে, আমারটায় কেন ভাগ বসালে?

তানিয়া বললো, হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছে করলো আর তোমাকে একটা চুমু খেতেও ইচ্ছা করলো, তাই।

আমি তো অবাক! বললাম, কি বলছো ঠিক বুঝতে পারছি না।

সে বললো, তোমার ঠোটের স্পর্শ কাপের যে জায়গায় আছে ঠিক সেখানেই আমি চুমুক দিচ্ছি। তাই চা খাওয়া হলো আর চুমুও খাওয়া হলো। তবে এটা একটু ঘুরিয়ে চুমু খাওয়া। তবে রোমান্টিক, তাই না?

তারপর থেকে সব সময়েই এ পদ্ধতিতে চুমু আর চা দুটোই এক সঙ্গে চলছে। মনে পড়ে, একদিন আমাদের বাসায় সে অর্ধেক চা খেয়ে রেখে দিল। আমি বাকি অর্ধেক খাওয়ার জন্য কাপ হাতে নিয়েছি। দেখি কি চায়ের কাপে তার ঠোটের গাঢ় লিপস্টিকের দাগ। বাকি চাটুকু খেয়ে সবার অজান্তে কাপটি লুকিয়ে রাখলাম। একটা রুমাল দিয়ে প্যাচিয়ে আমর ড্রয়ারে সযত্নে রেখে দিলাম। সেই কাপটা এখনো মাঝে মধ্যে বের করে দেখি।

তানিয়ারা চলে যাওয়ার পর আমার মা চায়ের কাপগুলো ধুয়ে গুণতে গিয়ে দেখেন একটা কাপ কম।

তিনি কিছুক্ষণ চেচালেন, ভাঙলেও তো দেখতে পেতাম।

তিনি অনেক খোজাখুজি করলেন। কিন্তু পেলেন না, এই টি সেটটা মায়ের খুব প্রিয় ছিল।

শ্রীপুরের কাছাকাছি এসে হঠাৎ বাস থেমে গেল এবং আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো। দেখলাম সামনে সারি সারি বাস, ট্রাক আর অন্য যানবাহন। কি কারণ খোজ করতেই জানা গেল, প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসে সামনে একটা বিশাল গাছ রাস্তার ওপর পড়ে গেছে। সরাতে কতোক্ষণ লাগবে ঠিক বলা যাচ্ছে না। তাই আপাতত বাস চলবে না।

বাসের ভেতরে পরিবেশটা গুমোট হয়ে আছে। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। মাথাব্যথাটা আবার জানান দিচ্ছে। ভাবলাম যাই, দেখি কোথাও এক কাপ চা পাওয়া যায় কি না। মামাতো ভাই সুমনকে বললাম, যাবি নাকি?

সে বললো, নাহ! তুমিই যাও। এই বৃষ্টিতে বের হতে ইচ্ছে করছে না।

একাই বাস থেকে নামলাম। পাশেই একটা চা স্টল পেয়ে গেলাম। সেখানে প্রচুর ভিড়। কোনোভাবে এক কাপ চা জুটলো। কিন্তু চা দোকানের ভেতরে জায়গা নেই। ভাবলাম, এখানে দোকানের সামনে না দাড়িয়ে চা খেতে খেতে সামনে যাই। দেখি গাছটা সরানোর কাজ কতোদূর হলো।

আপন মনে হাটছি আর চা খাচ্ছি। হঠাৎ পাশে দাড়ানো বাসের এক জানালা থেকে এক নারী কণ্ঠ আমাকে ডাকলো, রওনকভাই, বৃষ্টিতে ভিজে কোথায় যাচ্ছ?

আওয়াজটা শুনেই আমার বুকটা হালকা কেপে উঠলো, প্রকাশ করলাম না। এটা তানিয়ার গলা, পাশে ফিরে দেখি সেই চিরচেনা হাসি মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলাম তার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার জন্য। কিন্তু সে নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা বলছে, বেশ অবাক লাগছে।

মৃদুকণ্ঠে বললাম, এই তো, দেখি গাছটা সরাতে কতোক্ষণ লাগবে।

তানিয়ার পাশে তাদের কাজের মেয়ে, তার দুই সিট সামনে তার বাবা মা বসেছেন।

চা খাচ্ছ, আমারও চা খাওয়া দরকার। তানিয়া বললো।

আরেক কাপ এনে দিই, বললাম।

না তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। তোমার এ কাপটাই দাও, দুই চুমুক দিই।

বুকের কাপুনিটা আরেকটু বেড়ে গেল এবং সেই সঙ্গে চায়ের কাপ ধরা হাতটাও কাপছে। আমি কি ঠিক শুনেছি, তানিয়া আমার আধা খাওয়া চায়ের কাপ চাচ্ছে!

কই, দিলে না? তানিয়া এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তার হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

কোনো কথা না বলে কাপটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

সে চায়ে চুমুক দিচ্ছে ঠিক যে জায়গায় আমি চুমুক দিয়েছিলাম। তানিয়া এক মনে চা খাচ্ছে।

টিপ টিপ বৃষ্টিতে ভিজে তার চা খাওয়া দেখছি আর ভাবছি, এতোদিন পর আমাকে নিয়ে এ আবার কোনো খেলা শুরু হলো, নাকি অদ্ভুত সুন্দর ও রহস্যময় সেই ভালোবাসার জগতে সে আমাকে আবার নিমন্ত্রণ করছে।

খিলগাও, ঢাকা থেকে

প্রতিজ্ঞা

– তাজকেরা খানম নীলু

তখন ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়ি। ওই সময়ে আমাদের প্রতিদিনের সকালের নাশতা ছিল এক কাপ চায়ের সঙ্গে দুই তিনটি গরম রুটি। পরমানন্দে খেতাম সেসব চা ও রুটি। তবে ছুটি–ছাটাতে খিচুড়ি হলেও অন্য সব দিনে নির্ধারিত ওই চা রুটিতে আমাদের মোটেই অরুচি ছিল না, বরং আমরা বোনেরা প্রায়ই ঝামেলা বাধাতাম চায়ে মিষ্টি কম বেশি কিংবা বড় কাপ, ছোট কাপ নিয়ে।

এ ধরনের এক ইসু নিয়ে একদিন সকালে গণ্ডগোল বাধালাম। গো ধরলাম কিছুতেই পৌনে এক কাপ চা খাবো না। আমাকে পুরো এক কাপ দিতে হবে।

আম্মা বোঝালেন, আজ আর চা নেই। কাল বেশি করে দেবো।

আমি নাছোড়বান্দা, পুরো এক কাপ চা আমাকে আজই দিতে হবে। আম্মা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন দেখে শুরু করলাম মুষলধারে কান্না।

কান্নায় অতিষ্ঠ হয়ে আব্বা এসে আমার গায়ে কষে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন। সে সঙ্গে শাসালেন কান্না গিলে ফেলতে, না হলে আমার কপালে খারাবি আছে।

আব্বার কথায় কান্নাকে গিলে ফেলি ঠিকই কিন্তু রাগে, অপমানে চাটুকু উঠোনের পাশে আম গাছের নিচে ফেলে দিই এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, যে চায়ের জন্য এতো অপমান সে চা আর কোনোদিন খাবো না, জীবনেও না।

এরপর কতো অমাবস্যা পূর্ণিমা চলে গেছে, আমি আর চা খাইনি। রাগের বশে বাসায় চা বানানোও বন্ধ করে দিলাম।

এক দুলাভাই তো বলেই ফেললেন, চা বানাতে পারিস না তো, তোর বিয়ে দেবো কি করে?

অথচ কি আশ্চর্য! আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল এমন এক পরিবারের সঙ্গে যাদের কারো চায়ে আসক্তি নেই। ফলে শ্বশুরবাড়িতে চা নিয়ে আমাকে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি।

স্বামী ভদ্রলোক তো আরো এক কাঠি সরস! নিজে চা খায় না বলে বন্ধু সমাজে তা পরিবেশনের প্রয়োজনও বোধ করে না। অনেক সময় অনেকে ফিনিশিং টাচ দেয়ার কথা বলে চা খেতে চাইলে সে এক দৌড়ে দোকান থেকে পাতা এনে দেয়।

আমি অনেক দুধ, পাতা খরচ করে চায়ের এমন জঘন্য একটা কালার দাড় করাই যা দেখে নিজেই লজ্জা পাই।

সিজারিয়ান অপারেশনে যখন আমার প্রথম সন্তান জন্মায় তখন আম্মা উপদেশ দেন, চা খাও, শরীরের ব্যথা–বেদনা কমবে।

মায়ের কথায় চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু ফল হলো উল্টো। চা খেয়ে মনে হলো বমি আসবে। যদিও অন্যরা সেই বিস্বাদ তরল তৃপ্তি সহকারেই গলাধঃকরণ করে।

এরপর আমার আর চা খাওয়া হয় না। ইদানীং আমার ছেলেমেয়েরা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেলে চাখোরদের দলে ভিড়ে যায়।

এক আপা তো বলেই ফেললেন, কি রে, তোরা স্বামী–স্ত্রীতে চা বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও তোদের বাচ্চারা এমন চা খোর হলো কি করে?

জবাব দিই, মনে হয় টিভির অ্যাড দেখে ওরা প্রভাবিত হয়েছে। বেড়াতে গেলে ওরা চা মিস করে না। তাদের এ অতি আগ্রহ দেখে মনে হয় চা খেয়ে যেন তারা পুণ্যের কাজ করছে।

যাক, যে চা নিয়ে এতো ঘটনা সে চা বাগান কখনো নিজের চোখে দেখিনি, অথচ একদিন সে সুযোগও এসে গেল। আমার এক দুলাভাই হবিগঞ্জের এডিসি।

কিছুদিন আগে দলবল নিয়ে গেলাম সেখানে। হবিগঞ্জের চা বাগানে নানান পোজে ছবি তুললাম। চা বাগানের লোকদের কাছে চা গাছের ইতিবৃত্ত শুনলাম।

দুলাভাই আমার চা না খাবার ইতিহাস জানেন। তাই বললেন, নীলু, এই যে এতো মুগ্ধ হয়ে তাদের কথা শুনলে আবার দেখলাম কচিপাতাও সংগ্রহ করলে, এসবে কি হবে, তুমি তো চা খাও না?

বললাম, ওদের মতো কচিপাতার ভর্তা খাবো।

দুলাভাই বললেন, শুধু ভর্তা কেন? এখানকার চা বাগানের তাজা চা খাও, দেখবে তোমার সব রাগ চলে গেছে।

বললাম, দুলাভাই, প্রথমে চা–কে আমি ছেড়েছিলাম সত্য। কিন্তু এখন চা–ই আমাকে ছেড়ে গেছে। খেতে পারি না, সহ্য হয় না, বমি আসে।

হবিগঞ্জের নানান জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি। খাসিয়া পুঞ্জিতেও গেছি।

সেখানে আমার বোন আমাকে বললেন, তুই খাসিয়াদের হাতের চা খেয়ে দেখ, এমন মজার চা আর কোথাও পাবি না। আমার বিশ্বাস, তোর মোটেও বমি হবে না।

আমরা যখন খাসিয়াদের বাড়িতে গেলাম, তারা তখন বিভিন্ন নাশতাসহ আমাদেরকে চা পরিবেশন করে। দুলাভাই এবং আমার বোনের অনুরোধে তাদের চা-টা খেলাম। এবং কি আশ্চর্য, আমার কোনো বমিই হলো না, বরং আমার বোনের মতো আমারও দুই কাপ খেতে ইচ্ছা হলো।

কিন্তু দুলাভাই তাকিয়েছিলেন বলে লজ্জায় খেতে পারলাম না।

গাড়িতে উঠতে উঠতে দুলাভাই বললেন, আজ তাহলে তোমার প্রতিজ্ঞা ভাঙলো?

হাসতে হাসতে বললাম, তাদের এই অসাধারণ চায়ের রহস্য কি জানেন?

দুলাভাইয়ের এক স্টাফ জানালেন, ওদের পাতা এক নাম্বার, পানিও এক নাম্বার। স্বচ্ছ কুয়ার পানি আর হাতের যশই এ অসাধারণ চায়ের একমাত্র রহস্য।

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

নিমেষে

– নাজমুল নাগীব ধ্রুব

অনেক দিন আগের কথা। তখন আমাদের বাসার সবাই সকালবেলা চা খায়। কিন্তু আমি খাই না। খাই না মানে আমাকে খেতে দেয়া হয় না।

আমি খেতে চাইলে আম্মু ধমক দিয়ে বলেন, তোমার খাওয়ার দরকার নেই, ছোটরা চা-কফি খায় না, খাওয়া ভালো না ইত্যাদি।

কিন্তু কেন খারাপ তা আর কেউ বলেন না।

একদিন আমরা সবাই মিলে আমার খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

খালামণি নাশতার সঙ্গে আমাদের সবাইকে চা দিলেন। আমাকেও দিলেন। আমার যে কি আনন্দ হলো! আমি কাপে চুমুক দেয়ার আগে আম্মুর দিকে তাকালাম।

আম্মু মুচকি হাসলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

ভাইয়ার দিকে তাকালাম। ভাইয়াও কিছু বললেন না।

তারপর আব্বুর দিকে তাকালাম। আব্বু কিছু বলার আগেই হঠাৎ চাসহ কাপটা আমার হাত থেকে পাকা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

মনটা আমার ভারী খারাপ হয়ে গেল।

কেউ কিছু বললো না বটে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কাপটা ভেঙে যাওয়াতে খালামণির মন খারাপ হয়ে গেল।

নিমেষেই আমর আনন্দ ভরা মনটা ভারী হয়ে এলো। চা আর খাওয়া হলো না।

সেগুনবাগিচা, ঢাকা থেকে

একদিন বাংলোয়

এক.

তোর বাবা নিশ্চয়ই বৃটিশ ছিল।

সাহেব, তুই একথা বললি ক্যান।

তোর গায়ের রঙ শাদা তাই। বাকিগুলোর তো কালো। আর তুই তো বেশ লম্বা। তোর বয়সও তো বোঝা যায় না।

কি জানি সাহেব, আমার মা তো কালো। তবে আমার দাদি অনেক ফর্শা ছিলেন।

তিনি যখন কাজ করতেন তখন কি ইংরেজ সাহেব ছিল?

হ্যা।
আচ্ছা, তুই এখন যা।
সাহেব তোর বাংলোয় একদিন আসবো।
ভুলেও এই কাজ করিস না, মানুষ দেখবে।
দেখলে দেখবে!
ক্যান আসবি।
বুঝিস না বুঝি!
দ্যাখ, তুই আমাকে বিপদে ফেলবি!

দুই.

তোর সমস্যা কোথায়?
কোনো সমস্যা নেই।
তাহলে দাড়িয়ে আছিস ক্যান! পাতি (চাপাতা) তুলতে যা!
যাবোই তো! কতো দিন পরে তোকে দেখলাম। বুখার (জ্বর) হয়েছিল শুনলাম। সেদিন সারা দিন সেকশনে (চা চাষ এলাকা) ভিজলি, তখনই বুঝেছিলাম তোর বুখার হবে।
আমার বুখার হলে তোর কি?
সে তুই বুঝবি না।
বুঝিয়ে বল।
তোকে আমি ভালোবাসি।
তোর তো বেটা–বেটি (ছেলেমেয়ে) আছে। মানুষ শুনলে কি বলবে।
তুই বললেই তো মানুষ জানবে।
কে যেন এই দিকে আসছে, এখন যাই।

তিন.

সাহেব তোর পা দ্যাখা।
ক্যান।
রঙ দেবো।
সবাই তো মুখে গায়ে দিয়ে গেল, লাল পূজা তো তাই দ্যায়। তুই পায়ে দিবি ক্যান।
তাদের জন্য তো উৎসব আর আমার জন্য তো পূজা।
তা এক ফোটা লাগালি ক্যান! আবার মাথা পায়ে দিলি ক্যান।
আমার যায়গা তো তোর পায়ে, তাই।
তোর ভয় করে না?
ভয় করে। কিন্তু মন মানে না।
তোর বাংলোয় আমাকে কাজে নে। সেকশনে তোর সঙ্গে কথা বলতে পারি না।
আসলে তুই কি চাস বলতো?

চার.

বেয়ারা কি হয়েছে। নক করছিস ক্যান?

সাহেব, আমি।
আমি কে!
আমি – আমি।
গোসল করছি। বাইরে বস।
না। দরজা খোল, আমি আসবো।
(দরজা খুললাম)
বেয়ারা কোথায়! তোকে কেউ দেখেনি তো! তুই চলে যা! তুই মরবি, আমাকেও মারবি।
হিঃ হিঃ হিঃ সাহেব, তুই কাপছিস! তুই ভয় পেয়েছিস?
হ্যা, ভয় পাচ্ছি।
ভয়ের কিছু নেই। তোর বেয়ারা কাউকে কিছু বলবে না! তোকে খুব পছন্দ করে। তোর জন্য জান দিয়ে দেবে।
আচ্ছা, তুই গেস্ট রুমে বস। আমি আসছি!
....
....
এতো তাড়াতাড়ি গোসল করলি?
হ্যা, বল, কি হয়েছে!
কিছু না। পানি খাবো।
তুই কি কিছু চাচ্ছিস।
তুই বুঝিস না!
বুঝে দেখ, পরে আফসোস করিস না!
করবো না!
....
....
কাদছিস ক্যান, আফসোস হচ্ছে!
সাহেব, সব কান্নাই কি আফসোসের!

পাচ.

সাহেব, তুই নাকি চলে যাচ্ছিস!
হ্যা, কম্পানির আদেশ হয়েছে।
আমাকে সঙ্গে নিয়ে যা।
দ্যাখ, তুই যেতে পারবি না। আমিও নিতে পারবো না।
জানি। তোর সঙ্গে কি আর দেখা হবে না?
কি জানি।
হবে, তুই যখন বড় সাহেব (ম্যানেজার) হবি তখন।
আবার তোকে কম্পানি এখানে বদলি করবে।
অনেক দিন পর। প্রায় পচিশ বছর। আমি আবার এসেছি আমার পুরনো বাগানে। বড় সাহেব না, আরো অনেক বড়। শুয়ে আছি কোনো এক বাংলোয়। তার কথা মনে পড়ছে।
বেচে নেই। থাকলে হয়তো খুশি হতো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

বিমুখ স্বামী

– হুমায়রা আনিস

চায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্লাস সেভেনে থাকতে। একদিন আমার মা এক কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে এসে বললেন, নে, এটা খেয়ে দেখ। এতো মজার একটা খাবার তুই খাস না।

ব্যস, এরপর থেকে চা না খেলে আমার দিনই শুরু হয় না।

একবার আমার বান্ধবী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, বেহেশতে গেলে তুই সর্বপ্রথম কি খেতে চাইবি?

আমি একটুও দ্বিধা না করে উত্তর দিয়েছিলাম, চা।

তবে চা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল মেডিকালে পড়ার সময় হস্টেলে থাকতে গিয়ে। প্রায়ই লোডশেডিং। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। হিটার জ্বালাতে পারছি না। ক্যান্টিন অনেক দূরে। চা খাবো কিভাবে? ভাগ্যক্রমে আমরা রুমমেটরা সবাই চায়ের ভক্ত। ফলে আমাদের সবার মন খুবই খারাপ।

বুদ্ধি বাতলে দিলেন আমাদের হেলেনা বুয়া। কোথা থেকে দুটো দশ ইঞ্চি ইট নিয়ে এসে বারান্দায় পাশাপাশি রেখে হাড়ি বসিয়ে দিলেন। এরপর পেপারের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দুই ইটের মাঝে হাড়ির নিচে দিয়ে দিলেন। তৈরি হলো আমাদের অতি প্রিয় চা।

অনেকে আমাদের এই চা পার্টিতে যোগ দিতো। অনেকে চা তৈরির এই অভিনব পদ্ধতি দেখতে আসতো। এরপর থেকে লোডশেডিং, নো চিন্তা! আগে দুধ চিনি দিয়ে চা খেলেও এখন খাই দুধ চিনি ছাড়া একেবারে ন্যাচারাল চা। এখন আমার দুই বছরের মেয়েকেও মাঝে মধ্যে দুই এক চামচ চা খাওয়াই। ওই যে একই কথা, *এতো মজার খাবার খাবে না।*

তবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ আমার অতি ভালোবাসার স্বামীকে এই চায়ের অভ্যাস করাতে। যখন আমার স্বামী বাইরে থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে আসে তখন চকচকে চোখে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিই?

সঙ্গে সঙ্গে মুখ অন্ধকার করে আমার স্বামীর উত্তর, তোমার ইচ্ছা হলে দাও। তবে আমি চা খেতে পছন্দ করি না।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

বাচ্চুভাই

– মোহাম্মদ মাসুম সিদ্দিকী সুমন

সালটা সম্ভবত ১৯৯২। আমি তখন ক্লাস ফোরের ছাত্র।

আব্বা একদিন বললেন, আমার এক আত্মীয় গ্রামে থাকে। সেখানে একবার যাওয়া দরকার। প্রথমে আব্বা একাই যেতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা দেখে আমাকে নিতেও রাজি হলেন।

এরপর আব্বা আর আমি গ্রামের উদ্দেশ্য রওনা দিলাম।

প্রথমে বাসে চাপলাম।

অনেকক্ষণ বাস চলার পর এক সময় আব্বা বললেন, সামনের স্ট্যান্ডে আমাদের নামতে হবে।

স্ট্যান্ডে নেমে দেখলাম শুধু মাঠ আর মাঠ, দুই চারটি দোকানপাট নিয়েই একটা স্ট্যান্ড।

এবার আব্বা বললেন, কাচা রাস্তা দিয়ে আরো পাচ ছয় মাইল হাটতে হবে।

প্রথমে ভালোই লাগছিল। কিন্তু যখন চৈত্র মাসের কড়া রোদ গায়ে জ্বালা ধরালো তখন প্রায় কাদার মতো অবস্থা। রাস্তায় ছিল প্রচুর ধুলা।

গ্রামের নাম গাবুরদিয়া। মধুখালী থানার লোকজন অবশ্য আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে *গাবুদদে* নামেই চেনে। ধুলা, রোদ, মাঠ পাড়ি দিয়ে আমরা গ্রামে এসে গেলাম। কিন্তু গ্রামটার বাড়িঘর ছিল অন্য ধরনের। ঠিক পাহাড় নয়, টিলার মতো উচু মাটির ওপর এক একটা বাড়ি। আমাদের ঘাড় উচু করে দেখতে হচ্ছিল। বর্ষাকালে এখানে পানি হয়। এ জন্য বাড়িগুলোর এ ব্যবস্থা।

অবশেষে আমরা একটু বেশ উচু বাড়িতে আসি। কারণ এটাই আমাদের আত্মীয়ের বাড়ি।

আমাদের দেখে ওই বাড়ির লোকজন ভূত দেখার মতোই চমকে গিয়েছিল। কারণ *এক.* আব্বা অনেক বছর পর সেখানে গিয়েছে, *দুই.* ধুলাবালিতে আমরা সম্পূর্ণ একাকার ছিলাম।

আত্মীয়তার যোগসূত্রে এটা আমার আব্বার মামাতো বোনের বাড়ি। সেই ফুপু আমাদের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথমে হাত-মুখ ধোয়ার পানি দিলেন। তারপর গাছ থেকে ডাব পেড়ে আনলেন।

সামান্য নাশতা সেরে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। তাই টিনের ঘরে গরম ভালোই লাগছিল।

ফুপুর দুই ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে ক্লাস ফাইভে পড়েন। নাম বাচ্চু। আমার চেয়ে বয়সে তিন বছরের মতো বড় হবেন। কথা বলার মতো কাউকে না পেয়ে শেষে বাচ্চুভাইয়ের সঙ্গেই সখ্য গড়তে হলো। বাচ্চুভাইকে আমার ভালো লাগলো। কারণ আমি শহরের গল্প করলে তিনি অনেক আগ্রহ নিয়ে সেসব শুনতেন এবং নানান প্রশ্ন করতেন।

আমিও খুব মজা পাচ্ছিলাম।

রাতে ফুপু খাওয়া-দাওয়ার বেশ ভালোই আয়োজন করলেন। মাছ, মুরগি, পায়েস। হারিকেনের আলোয় শুধুই ঘামছি। অনেক কষ্টে খাওয়া শেষ করে উঠোনে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুমাতে গেলাম। কিন্তু গরমের জন্য কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

এভাবেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙলো তখন সকাল। হাত-মুখ ধুয়ে আব্বাকে বললাম, আজই চলে যেতে হবে।

আব্বা কিছুতেই আসতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমার জন্য বিকেলেই ফেরার কথা বললেন ফুপুর কাছে।

সারাটা দিন কি করা যায় এই ভেবে বাচ্চুভাইয়ের সঙ্গে তাদের গ্রামের সব কিছু দেখার জন্য বের হলাম।

গ্রামটা বেশ বড়ই ছিল। একটা প্রাইমারি স্কুল। খাল, রাস্তা তেমন ভালো নয়। এক সময় বললাম, তোমরা বাজার করো কোথা থেকে?

তিনি আমাকে বললেন, এখান থেকে চারটা গ্রাম পাড়ি দিয়ে উজানদি গ্রামে একটা জায়গায় সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে।

সেখানে দোকান নেই?

দুইবার গিয়েছি, কয়েকটা মাত্র দোকান আছে।

কিভাবে যেতে হবে?

পায়ে হাটা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

তাহলে আমি ও আপনি বাজার থেকে একটু ঘুরে আসি।

সে তো অনেক সময় লাগবে। বাড়িতে তুমি বলে আসোনি।

কিছু হবে না চলেন।

তিনি রাজি হলে আমরা হাটা শুরু করলাম।

কিছুক্ষণ হাটি, বাচ্চুভাইকে জিজ্ঞাসা করি, আর কতো দূর?

তিনি শুধুই বলেন সামনে।

আবার জিজ্ঞাসা করি।

বলেন সামনে।

আমি মুখে কিছু বলতে পারছি না। কারণ আমার ইচ্ছাই বাজারে যাওয়া।

অবশেষে নির্দিষ্ট বাজারে এসে পৌছালাম। মাত্রই চার পাচটা দোকান আর রাস্তার অপর পাশে বয়ে গেছে নদী। নদীতে চর জেগেছে।

বললাম, আগে একটু নদী দেখে আসি।

বাচ্চুভাই আমার সঙ্গে গেলেন।

অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তারপর আবার বাজারে এলাম। বললাম, বাচ্চুভাই, আসেন কিছু খাই।

দেখলাম একটা মাত্র দোকানে চা তৈরি হয়। সেই দোকানটাতে গিয়েই বসলাম। পানি খেলাম। তারপর বিস্কিট হাতে নিয়ে বাচ্চুভাইকে দিলাম এবং দোকানদারকে বললাম চা দিতে।

বাচ্চুভাই প্রথমে বললেন তিনি খাবেন না।

কিন্তু আমার পীড়াপিড়িতে খেতে রাজি হলেন।

আমি প্রথমে চা কাপ পিরিচসহ বাচ্চুভাইকে দিলাম।

বাচ্চুভাই চা খাচ্ছিলেন না। কারণ তিনি এর আগে কখনো খাননি। আমি বিস্কিট খাচ্ছিলাম দেখে তিনিও খাচ্ছেন না।

হঠাৎ শুনি কিছু ভাঙার শব্দ এবং বাচ্চুভাইয়ের চিৎকার।

আসলে ঘটনা ছিল এ রকম – বাচ্চুভাই আমার দেরি দেখে ভেবে পাচ্ছিলেন না কিভাবে খাবেন। তাই তিনি একবারেই মুখে গরম চা ঢেলে দিয়েছিলেন। তাতেই তার মুখ পুড়ে গিয়েছিল এবং হাতের কাপ পিরিচ দূরে ছিটকে ফেলেছিলেন।

আমার তখন প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল আবার কিছুটা দুঃখ বোধও হচ্ছিল।

দুপুরের দিকে আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে, এমন সময় আমরা ফুপুদের বাড়ি পৌছাই।

এসেই আমরা অবাক! সবাই দেখি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আব্বা প্রথমেই এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলে?

আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে সব বললাম এবং শেষে বাচ্চুভাইয়ের চা খাওয়ার ঘটনা বললাম।

দেখি আব্বার মুখেও চাপা হাসি।

খেয়ে-দেয়ে বিকেলেই রওনা দিয়েছিলাম। জানি না, ছাপা হলে বাচ্চুভাইয়ের গাবুরদিয়া গ্রামে এ লেখা পৌছাবে কি না।

কল্যাণপুর, ঢাকা থেকে

চুলের যত্নে

- নাসরিন ইসলাম

চা শব্দটি শুনলেই আমাদের বেশির ভাগের চোখে কাপে করে পরিবেশিত পানীয়র ছবি ভেসে ওঠে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পানির পরে যে পানীয়টি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পান করা হয় তা হলো চা। চা যে শুধু পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা নয়। চুলের যত্নেও চা খুব উপকারী। চা দিয়ে নানান উপায়ে চুলের যত্ন নেয়া যায়। চুল ঝরঝরে, সিল্কি, সমৃণ করতে চায়ের জুড়ি নেই। চুলের চর্চায় চায়ের তিনটি ব্যবহারের কথা জানাচ্ছি –

এক. রুক্ষ চুলের রুক্ষতা দূর করতে চায়ের লিকার, পাতিলেবুর রস, মেহেদি বাটা এক সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট করুন। এটা চুলে লাগিয়ে রাখুন পয়তাল্লিশ মিনিট। এরপর চুল ধুয়ে ফেলুন। প্রতি সপ্তাহে একবার লাগাতে পারেন। চুলের রুক্ষতা দূর হয়ে যাবে।

দুই. শ্যাম্পু করার পরও যাদের চুল লেপ্টে থাকে তারা এর প্রতিকারের জন্য শ্যাম্পু করার পর চায়ের পাতা ভিজিয়ে সেই পানি দিয়ে চুল ধুলে ফেলুন। চায়ের পাতা শ্যাম্পু করার প্রায় দুই ঘণ্টা আগে ভেজাতে হবে।

তিন. ফোটানো চায়ের পাতার পানির সঙ্গে ডাবের পানি মিশিয়ে মিশ্রণটা পুরো চুলে তেলের মতো করে লাগাবেন। গোসলের আগে এটা প্রতিদিন লাগাতে হবে। মিশ্রণটা বেশি করে বানিয়ে রেফ্রিজারেটরে রাখতে পারেন। চুল ঝরঝরে করতে এটি এক কথায় অতুলনীয়।

পরিবাগ, ঢাকা থেকে

উপরের তিনটি সাজেশন লেখিকার নিজস্ব – যাযাদি

জরিমানা

- নাসির উদ্দিন

আমি সউদি আরবের আভা প্রদেশে আছি। প্রায় পাচ বছর হতে চলছে। এখানে আমাদের হোটেল ব্যবসা আছে। আমাদের পরিবারের তিনজন এটি চালাই। আমাদের হোটেলে সউদিয়ান বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে চা, কফিও বিক্রি করি।

একদিন আমি ক্যাশে বসা। আমার দুই কাকা কোনো এক কাজে আমাকে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেছেন। হোটেলে আমি আর একজন কর্মচারী।

দশ পনেরো মিনিট পরে দুজন কাস্টমার এলো চা খেতে। চা দেয়া হলো।

তারা চা খাচ্ছে এবং আড্ডা দিচ্ছে। এরই ফাকে ছোট একটা পোকা উড়ে এসে তাদের একটা কাপে পড়লো। (যদিও হোটেলে তিনটি অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক পোকা দমনের মেশিন রয়েছে)। সঙ্গে সঙ্গে তারা উত্তেজিত হয়ে আমাকে চায়ের কাপটা দেখালো।

শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের বললাম, এটা তো আগে ছিল না। অর্থাৎ চায়ের সঙ্গে ছিল না। উড়ে এসে পড়েছে। ঠিক আছে এটা ফেলে দাও, তোমাকে নতুন করে আরেক কাপ চা দিচ্ছি।

না। সে মানবে না। এমনকি সে আমাকে অকথ্য ভাষায় অনেক কিছু শুনিয়ে দিল এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললো, সে কাপটা নিয়ে যাবে পৌর অফিসে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

কতো করে বিনয়ের সঙ্গে বোঝালাম, তোমার চায়ের দাম দিতে হবে না। উল্লেখ্য, সউদি আরবে এক কাপ চায়ের দাম এক রিয়াল অর্থাৎ বাংলাদেশি পনেরো ষোল টাকা।

আমার বিনয়ে তার মন গললো না। সত্যি সত্যিই সে চলে গেল পৌর অফিসে।

সে যাওয়ার দুই ঘণ্টার ভেতরে দুইজন পৌর কর্মকর্তা এলো হোটেলে এবং নোটিশ দিল যে এখনই হোটেল বন্ধ করতে হবে, আগামী তিন দিন বন্ধ রাখতে হবে।

এখানেই শেষ হলো না। একটা কাগজের মেমো দিল আমাকে যাতে লেখা ছিল, আমাদের ওপর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে পাচশ রিয়াল। বাংলাদেশি টাকায় প্রায় আট হাজার টাকা।

কি আর করা! তাদের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের উপস্থিতিতেই আমাকে তিন দিনের জন্য হোটেল বন্ধ করতে হলো। তারপর পৌর অফিস থেকে তাদের নিয়ে আসা তালা ঝুলিয়ে চাবিটা নিয়ে তারা চলে গেল।

অবশ্য যাওয়ার সময় তারা এ মর্মে আদেশ দিল, আজকের মধ্যেই যেন তাদের ধার্যকৃত জরিমানা পরিশোধ করি। অন্যথায় আরো এক সপ্তাহের জন্য হোটেল বন্ধ রাখতে হবে।

উপায়ান্তর না দেখে ওই দিনই তাদের দেয়া আদেশ পালন করতে বাধ্য হলাম। কারণ এটা বাংলাদেশ নয় যে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে জরিমানা মওকুফ করানো কিংবা কমানো যাবে অথবা হোটেল তিন দিনের আগেই খোলা যাবে।

এই ঘটনা ছাড়া আমাকে একবার জরিমানা দিতে হয়েছিল মাথার চুল এবং হাতের নখ বড় রাখার জন্য। তখন প্রায় দেড় হাজার টাকার মতো জরিমানা দিতে হয়েছিল। হোটেলে অপরিষ্কার কাপড় পরিধান করলে কিংবা অপরিষ্কার যে কোনো কিছুর জন্য শাস্তি স্বরূপ জরিমানার বিধান রয়েছে।

কিছুদিন হলো দেশে এসেছি। আমাদের দেশের হোটেল ও চায়ের দোকানগুলোর পরিবেশ দেখে মনে পড়ে সউদিতে আমার হোটেলের চা নিয়ে সেই বিড়ম্বনার কথা।

আমি মনে করি, ইচ্ছা করলে বাংলাদেশেও এমন আইন করা যেতে পারে এবং র‌্যাবের মাধ্যমে এটি কার্যকর করা যেতে পারে।

চাঁদপুর, কুমিল্লা থেকে

ঘটনা

–অনু

যায়যায়দিন সাধারণত আম্মু আব্বুই বেশির ভাগ পড়েন। সেদিন কি মনে করে যায়যায়দিনের একটা সংখ্যা হাতে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলাম। এবং একটা পৃষ্ঠায় এসে দেখলাম যাযাদির পরবর্তী সংখ্যার বিষয়বস্তু *চা* নিয়ে। মনে পড়ে গেল চা নিয়ে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা। লিখবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু লিখতে বসে বুঝলাম লেখালেখি কতো কঠিন।

এক.

আমার ছোট বোন ভীষণ চাখোর। চা দেখলেই তার খেতে ইচ্ছা হয়। একদিন আম্মু টিকিয়া ভেজে বাকি তেলগুলো একটা কাপে রেখে দিলেন। দেখতে ঠিক রঙ চায়ের মতো লাগছিল।

কিছুক্ষণ পর আমার ছোট বোন ওয়াক ওয়াক করতে করতে রান্নাঘর থেকে বের হলো। আম্মু দ্রুত রান্না ঘরে ঢুকে বুঝতে পারলেন সে চা মনে করে তেল খেয়েছে।

দুই.

এই ঘটনাটাও আমার ছোট বোনকে নিয়ে। এক বিকেলে আম্মু চা বানিয়ে সবাইকে দিলেন।

আমার ছোট বোন তার চা–টা দ্রুত ওঠাতে গেল, অমনি তার হাতের ঝাকানি খেয়ে তা ওর গায়ে পড়ে গেল। চা–টা তেমন গরম ছিল না। তবুও সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে জুড়ে দিল।

আম্মুও বিচলিত হয়ে রেফৃজারেটর থেকে ঠাণ্ডা পানি বের করতে গেলেন। ফৃজে সে সময় ঠাণ্ডা পানি ছিল না। ফৃজে ছিল RC UPPER 10–এর একটি দুই লিটারের বোতল। আম্মু সেটাকেই ঠাণ্ডা পানি ভেবে তার গায়ে ঢেলে দিলেন। যখন ফেনা উঠতে শুরু করলো, আম্মু তখনি বুঝলেন, তিনি ভুল করে তার গায়ে আরসিকোলা ঢেলে দিয়েছেন।

আমার ছোট বোনও তখন কান্না থামিয়ে হাসতে শুরু করলো।

তিন.

আমার আব্বু মোটামুটি ভালো চা বানান। একদিন আব্বু চা বানাতে গিয়ে দেখেন চাপাতি নেই। তিনি মামাকে চাপাতা আনতে পাঠালেন।

মামা পাতা এনে কাচের বয়ামে ভরে আলমারির দ্বিতীয় তাকে রেখে দিলেন।

আলমারির উপরের তাকে একই বয়ামে ছিল কালো জিরা। আব্বু কালো জিরাকে চাপাতা ভেবে ফুটন্ত পানিতে ছেড়েদিলেন। তিনি যখন দেখলেন কোনো রংই হচ্ছে না তখন মামাকে ডেকে বললেন, কি রে, কি চাপাতা এনেছিস, কোনো রঙ হয় না?

মামা গিয়ে দেখেন পানিতে কালো জিরা দিয়ে রেখেছেন আব্বু।

চার.

আম্মু একদিন চা বানাবেন বলে চুলোয় পানি বসালেন। আলমারিতে পাশাপাশি দুটো ডানোর পটে একটিতে ছিল ময়দা আর অপরটিতে ছিল গুড়ো দুধ। আম্মু ময়দাকে দুধ ভেবে গরম পানিতে ছেড়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর আম্মু দেখলেন সব কেমন নাশতা নাশতা হয়ে গেছে। আম্মু ভুল বুঝতে পেরে আবার চা বানিয়ে তা পরিবেশন করলেন।

পাচ.

এই ঘটনাটা মজার নয়। আমার নানা বাড়ির স্থানীয় এক লোক অন্য আরেক লোকের সঙ্গে বাজি ধরলেন, তিনি যদি সদ্য চুলা থেকে নামানো গরম চা খেতে পারেন তবে অপরজন তাকে পঞ্চাশ টাকা দেবেন।

কথা অনুযায়ী তিনি চুলা থেকে নামানো গরম চা গলায় ঢেলে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গলা ধরে গরুর মতো চিৎকার করতে করতে সারা মাঠ দৌড়াতে লাগলেন।

ততোক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। পরে তার চিকিৎসার জন্য দশ হাজার টাকার মতো লেগেছিল।

পাঠকের কাছে একটা অনুরোধ, আপনারা কখনো কেউ কারো সঙ্গে কোনো প্রকার বাজি ধরবেন না। আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীকেও এ ব্যাপারে সতর্ক করুন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

মূল্যায়ন

আমার আম্মা একজন সিনিয়র স্কুল টিচার। ছোটবেলা থেকে ভালো ছাত্রী হিসেবে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে রান্নায় তেমন পারদর্শী নন। স্কুলের বড় আপা নিজে ডেকে তাকে চাকরি দেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসে তাকে মোটেই কোনো মর্যাদা পেতে সাহায্য করেনি তার ডিগ্রি ও চাকরি। রান্না না পারার কারণে তাকে অনেক অপমান ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। কাজের লোক ছাড়িয়ে দিয়ে মশলা বাটা ও রুটি বেলার কাজে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। আম্মা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন সংসারের কাজ করতে, শ্বশুরবাড়ির সবাইকে তুষ্ট করতে।

আম্মা মশলা রাতে বেটে রাখতেন, যেহেতু স্কুল দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত। বাবার বাড়িতে লেখাপড়ায় ভালো থাকায় তিনি আদর ও সম্মান পেয়েছেন। সংসারের কাজে ফিরে তাকাতে হয়নি। গড়ে উঠেছিলেন স্বপ্নবিলাসী কাব্যপ্রিয় হিসেবে। চমৎকার সব কবিতা লিখতেন, আবৃত্তি করতেন। অপূর্ব সব ছবি আকতেন।

বলতে হবে অসম বিয়ে তার স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিল। সাংসারিক কাজ পারেন। তবে দ্রুত গতিতে নয়, নন তিনি চটপটে। পারেন না অনর্থক অর্থহীন গল্প করে মহিলা আসর মাতিয়ে তুলতে। ফলে শ্বশুরবাড়িতে কেউই তার সহায় হলো না। তার চমৎকার রেজাল্ট, সম্মানজনক চাকরি এ সবই অশিক্ষিত শাশুড়ি, ননদ, আধা শিক্ষিত দেবরদের কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল।

তিনি বাংলার নির্যাতিত নারীর প্রতীক। কুৎসিত গালিগালাজে তিনি হয়ে পড়েন ভীত-সন্ত্রস্ত, শ্বশুরবাড়ির লোকদের ভয়ে আজ থেকে আটাশ বছর আগের এমএ পাস স্বাবলম্বী মা ভয়ে থরথর করে কাপতেন। বর্তমানে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। বাড়ির বড় ছেলে হয়েও বাবা কখনো মায়ের পাশে অবলম্বন হয়ে দাড়াননি। আজও নয়। কেন তা জানি না।

যাই হোক। শেষ পর্যন্ত মৃদুভাষী, কাব্যপ্রিয় মা সংসার করার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেলেন। নানা আর তখন নেই। আমরা দুই বোন এখানেই জন্মালাম। সে এক বিরাট কাহিনী। সে কথা এখানে থাক।

বড় হলাম নানি, খালা, মামার আদরে। অবশেষে আমার তেরো বছর বয়সে খালা-খালুসহ ফিরে এলাম আমাদের বাবার বাড়ি। বাবাও তখন চান আমরা এখানে থাকি। খালাকে প্রয়োজন। খালা স্বভাবে মায়ের বিপরীত। একমাত্র তিনি পারতেন সকলের বৈরী আচরণ থেকে আমাদের আগলে রাখতে। তিনি টিট ফর ট্যাট (Tit of tat)-এ বিশ্বাসী। তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমিসট্রেস। ঘরের কাজে, চাকরি ক্ষেত্রে সমান পারদর্শী।

তার মতো করেই তিনি গড়ে তুলেছেন আমাদের দুই বোনকে। ফলে ছোটবেলা থেকেই আমরা ঘরের কাজ ও পড়ালেখায় সমান পারদর্শী হয়ে উঠলাম।

আম্মার কারণে সবার ধারণা ছিল আমরাও একই রকম হবো। কিন্তু আমার খালাম্মার অপরিসীম স্নেহ, ভালোবাসা ও চেষ্টায় আমরা আল্লাহর রহমতে তা হইনি। রান্না ও পড়াশোনায় দুটোতেই 'এ' গ্রেড। একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন।

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। আমার চাচি একদিন বেড়াতে আসেন আমাদের বাসায়। চাচি ও খালাম্মা গল্প করতে থাকেন আর আমি খালাম্মার ইশারায় চা বানাতে যাই। যখন চা বানিয়ে চাচির সামনে হাজির হই তখন আমার হাতে কাপ দেখে তিনি এতোই বিস্মিত হন, আমিও সে দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হলাম। এরপর চা খেয়ে তিনি হতবাক হয়ে পড়েন। যেন এটা কি করে সম্ভব?

বলেই ফেললেন, তুমি চা বানিয়েছো?

বলা বাহুল্য, আমার চায়ের মান এ প্লাস হয়। চাচির অবাক দৃষ্টি জানিয়ে দেয় আমাদের সম্পর্কে সবার কেমন ধারণা ছিল।

সামান্য এক কাপ চায়ে আমাদের মূল্যায়ন হয়ে গেল।

অথচ আমার মায়ের বাংলায় অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি ও সম্মানজনক চাকরি তাকে সারা জীবনেও শ্বশুর-বাড়ি থেকে মর্যাদা পেতে সাহায্য করেনি।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কড়া লিকার

– আবুল খায়ের মোস্তফা

১৯৮৩ সালের ঘটনা। সবেমাত্র চাকরি হয়েছে আমার। সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা সীমান্তের কাছাকাছি প্রথম পোস্টিং। জেলা সদরে একটা মেসে থাকি। প্রতিদিন হেলিকপ্টারযোগে অফিসে যাতায়াত করি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ অঞ্চলে বাইসাইকেলের ক্যারিয়ারে প্যাসেঞ্জার বহন করাকে *হেলিকপ্টার* বলে।

আমার একটা ধারণা ছিল, বর্ডার বেল্টের লোকজন টাউট, বাটপাড় বেশি। কারণ ওরা তো চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এখানে চাকরি করতে এসে সে ভুল ভেঙে যায়। মূলত সাতক্ষীরা অঞ্চলের গ্রামের এসব সাধারণ মানুষ অত্যন্ত শাদামাটা, সহজ-সরল প্রকৃতির। এরা অতিথিপরায়ণ এবং নিঝর্ঞ্ঝাট জীবনযাপনে বিশ্বাসী।

সাতক্ষীরা অঞ্চলের লোকজন কথা বলে টেনে টেনে। যেমন *খেইয়েছি, যেইয়েছি* ইত্যাদি। তাদের কথা বলার ধরন খুব ভালো লাগতো। ইচ্ছা করেই তাদের সঙ্গে বেশি মিশতাম এবং কথা বলতাম।

কোনো এক শুক্রবার। অফিস ছুটি। সকালের নাশতা সেরে বেরিয়ে পড়ি। হঠাৎ চায়ের নেশা হয়। অগত্যা একটা টি স্টলে ঢুকে পড়ি। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বসে আছি।

এমন সময় অল্প বয়স্ক একটা ছেলে টি স্টলে ঢোকে। ইতস্তত এদিক-সেদিক তাকিয়ে আমার পাশের টেবিলে বসে। ছেলেটার কাপড়-চোপড়, হাব-ভাব দেখে অনায়াসে বোঝা যাচ্ছিল, সে গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছে।

ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। এদিক-সেদিক তাকায়। কি যেন ভাবে। মনে হচ্ছে কি যেন খেয়াল করছে।

এক পর্যায়ে ছেলেটা টেবিলে একটা থাবা মেরে বলে ওঠে, *মেসিয়ার এই হানে চা লাগাও।*

কিছুক্ষণের মধ্যে মেসিয়ার এক কাপ চা দিয়ে যায়।

ছেলেটা চা মুখে না দিয়েই আবার চেচিয়ে ওঠে, এই মেসিয়ার, লেকার হইয়েছে না তো কি লেকার দেইয়েছ। লেকার আরো লাগাও।

মেসিয়ার চায়ের কাপ ফেরত নেয়। তারপর কড়া করে লিকার দিয়ে আবার পরিবেশন করে। ছেলেটা এবার চায়ের কাপ ধরে চুমুক দেয়। সঙ্গে সঙ্গে থুতু ছিটিয়ে কাপসহ চা ফেলে দেয়। মাথা নিচু করে লোলাতে থাকে। জিভ পুড়ে শেষ। মাথা নিচু করে বসা। জিভ দিয়ে টপ টপ করে লালা ঝরছে।

ছেলেটার এ কাণ্ড দেখে দোকানি ও অন্য কাস্টমাররা হো হো করে হেসে খুন। ছেলেটা কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে এবার বলে ওঠে, আমি লেকার বেশি দেতে কইয়েছি, তা কি এতো বেশি যে, *গাল পুড়ে ছাই হয়া যাবে? বোকারাম আবার হাসাতায়াছে, মনে কইরেয়েছে আমি গেরামতে আইয়েছি, চায়া খাইতে জানি না, তাই না?*

এ কথার পর দোকানের সবাই আরেক দফা অট্টহাসি দেয়।

দেরি না করে ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়ে আসি। জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, তুমি চা চুমুক দিয়ে খেতে গেলে কেন?

ছেলেটা জবাবে যা বললো তা হলো এই যে, সে এই প্রথম শহর দেখতে এসেছে। আগে কখনো আসেনি। চা কি জিনিস তা সে জানতো না। মনে করেছিল চা নামের নতুন এ জিনিসটা খেয়ে গ্রামে গিয়ে গল্প করবে। তাই সে চা খেতে ঢুকেছিল দোকানে। সে যে গ্রাম থেকে এসেছে, আগে চা খায়নি এটা যাতে কেউ বুঝতে না পারে সে জন্য প্রথমে অন্যান্য টেবিলে লক্ষ্য করছিল, কে কি বলে, কিভাবে দোকানদারকে ডাকে, লিকার দিতে বলে, চিনি দিতে বলে ইত্যাদি। ঠিক সেভাবে সেও বলেছিল। সে ভেবেছিল, গরম দেয়াকে লিকার বলে।

গ্রামের সহজ-সরল এক অশিক্ষিত কিশোর। সে জীবনে প্রথম চা খেয়ে গ্রামীদের কাছে গল্প দিতে চেয়েছিল। কিন্তু গরম চায়ের বিড়ম্বনায় নিজেই গল্প হয়ে ফুটে উঠলো।

মিস্ত্রিপাড়া, খুলনা থেকে

চাচা

- মোহাম্মদ আসিফ ইনজামাম

একটা চায়ের স্টল দেখে থামলাম। এতোক্ষণ নদীর বাধ ধরে হাটছিলাম আর দেখছিলাম আমাদের প্রতিবেশী দেশের উপহার। স্রোতস্বিনী নদীর খাল সংস্করণ দেখতে দেখতে হাপিয়ে গিয়েছিলাম। তাই স্টলটিতে বসলাম। পকেটে আছে মাত্র পনেরো টাকা।

একটা বাচ্চা ছেলে চা বানাচ্ছে। তাকে বললাম, এই তোমাদের এখানে চায়ের রেট কতো?

সে একটু অবাক হয়ে তাকালো। হয়তো কেউ তাকে কখনো তুমি করে বলে না। তারপর বললো, আদা এক লিকার দেড় আর দুধ দুই।

বললাম, আদা দাও একটা।

সে নিজের কাজে মন দিল আর আমি তার কাজ দর্শনে। এমন সময় কে যেন পেছন থেকে বলে উঠলো, ভাই, একটা টাকা দিন না, চা খাবো।

চমকে পেছন ফিরে দেখি এক বৃদ্ধ লোক। শরীরে জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক। অবস্থাদৃষ্টে পাগল মনে হলো। কিছুটা বিরক্ত হলাম। কিন্তু তার চাওয়ার ভঙ্গি এমন, না করতে পারলাম না। বললাম, বসেন।

থ্যাংক ইউ বলে লোকটি বসে পড়লো।

একটু অবাকই হলাম। বললাম, কোথায় থাকেন?

উত্তরে লোকটি এমন স্টাইলে ইংরেজি বলতে শুরু করলো যার আগা-মাথা কিছুই বুঝলাম না। বাধ্য হয়েই বললাম, চাচা, আমি ইংরেজিতে দুর্বল। দয়া করে বাংলায় বলেন।

চাচা বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, কি করবো বাবা। পাকিস্তান আমলে আমেরিকান অফিসে চাকরি করতাম তো, তাই ইংরেজি বলাটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

মনে মনে বললাম, আমেরিকান অফিসে চাকরি করেছো আর এখন এক কাপ চায়ের জন্য হাত পাততে হয়। মুখে বললাম, চাচা, তাহলে তো আপনার অনেক টাকা।

হ্যা, টাকা তো অনেকই ছিল। কিন্তু...।

কিন্তু কি?

ছেলে। ছেলে। সব ছেলেকে দান করে দিলাম আর ছেলে আমাকেই দান করে দিল। বলতে পারো নিজের সব সম্পদের বিনিময়ে কিনলাম শূন্য। বলেই চাচা পাগলের মতো হাসতে লাগলেন।

সে হাসিতে আনন্দ না বেদনা ঠিক ধরতে পারলাম না। হাসি থামলে বললাম, বেশ সুন্দর কথা বলতে পারেন তো আপনি!

কথা কি আর সাধে শিখেছি। দুনিয়ার বুকে টিকতে হলে কথা শিখতে হয়।

যা বলেছেন। তা চাচা, ছেলেকে সব দান করে বেরিয়ে পড়লেন?

ভুল বুঝেছো। বেরিয়ে পড়িনি। বের করে দেয়া হয়েছে।

আমার বুকে কে যেন আঘাত করলো। জীবনের ট্র্যাজেডি আমার দুঃসহ লাগে। সেই কারণেই হয়তো বললাম, এসব মানুষ কিভাবে করতে পারে?

চাচা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিভাবে পারে তা না জানলেও করতে পারে তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

আমি নিঃশব্দে মাথা ঝোকালাম।

চাচা বলে চললেন, প্রথম যেদিন বের করে দিয়েছিল সেদিন কষ্ট পেয়েছিলাম। কিন্তু এতোটা নয় যতোটা কাল পেলাম। জানো, কাল খুব ইচ্ছা হলো, ছেলেকে একবার দেখি। তাই দূর থেকে একটু দেখার জন্য তার দরজার ফাকে একটু চোখ রেখেছিলাম।

কিন্তু ছেলের বৌ আমাকে দেখে নিল। তারপর কি গালাগালি। না সহ্য করতে পেরে চলে এসেছিলাম। সে বলে, আমি নাকি চুরি করতে এসেছিলাম। আমার সম্পদের চোর নাকি আমি।

ছেলে তখন বাড়ি ছিল না। পরে শুনেছি সে নাকি বলেছে আর কোনোদিন এ রকম চেষ্টা করলে ঠেঙ্গিয়ে ঠিক করে দেবে। হাঃ হাঃ ...।

চাচার অযাচিত হাহাকার পরিবেশ ভারী করে তোলে। নিশ্চুপ থাকি।

চাচাই বলে ওঠেন, বাবা কি রোজ নদী দেখতে আসেন?

না চাচা, মনটা খারাপ হলে আসি।

কি সুন্দর নদী, কি হয়ে গেছে।

কি আর করা!

দেশটাই বুঝলে এমন। আমরা আর চাই না পরিশ্রম করে উন্নতি করতে। আমরা ভাবি কোনোদিন হয়তো একটা চমৎকার কিছু হবে আর দেশটা উন্নত হয়ে যাবে।

আমি কিছুক্ষণ অবাক হযে চাচার দিকে তাকিয়ে থাকি। তারপর বলি এসব শুনতে আর ভালো লাগে না চাচা। অনেক শুনেছি, অনেক ভেবেছি। দেখেছি কোনো সমাধান নেই। এখন আমাদের সত্যিই বসে থাকতে হবে কোনো চমৎকারের আশায়।

ততোক্ষণে আমার চা খাওয়া শেষ। উঠে দাড়ালাম। বললাম, আসি চাচা।

চাচাও উঠে দাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, Thank for your tea and company থ্যাংকস ফর ইয়োর টি অ্যান্ড কম্পানি। স্মিত হেসে চলে এলাম।

এর কিছুদিন পর আবার নদীর বাধ ধরে হাটছি। কিছু দূরে দেখতে পেলাম একটা জটলা। মনে হলো কেউ কাদছে খুব করুণ সুরে। এগিয়ে গেলাম। দেখি মাঝ বয়সের এক মানুষ সেদিনের সেই চাচার মৃতদেহ আকড়ে কাদছে।

বুকটা কেমন যেন করে উঠলো। পরিচয় খুব বেশি নয়। তবুও ...।

লোকমুখে শুনলাম, যে জড়িয়ে ধরে কাদছে সে চাচার ছেলে। এতোদিন খোজ রাখতো না – আজ ছুটে এসেছে। শুনলাম আরো এক ট্র্যাজেডি। চাচার মৃত্যু হয় ফুটপাথে শুয়ে থাকা অবস্থায়। বেওয়ারিশ লাশ। তাই কিছু সহৃদয় ব্যক্তি দাফনের জন্য চাদা সংগ্রহ শুরু করে। ইতিমধ্যে তার ছেলেও দশটি টাকা দিয়ে চলে যায়। বাড়ি গিয়ে সে শুনতে পায় তার বাবা মরেছে। তখন সে ছুটে আসে।

অবাক হয়ে দেখি, এই ছেলেই চাচাকে ঠেঙ্গাতে চেয়েছিল। কই এখন তো ঠেঙ্গাচ্ছে না।

চলে আসছিলাম। ট্র্যাজেডি ভরা জীবনে ট্র্যাজেডি আমার ভালো লাগে না। তখনই কে যেন কানের সামনে বলে উঠলো, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর টি অ্যান্ড কম্পানি।

চমকে পেছন ফিরে দেখি চাচার লাশের মুখে স্মিত হাসি।

সে হাসির রহস্যভেদ অসম্ভব।

রাজশাহী থেকে

শীতে

– প্রত্যুষ বসু

তখন আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী। শীতের সকাল, বাড়ির উঠানে রোদে বসে বই পড়ছি। একটু পরে কোচিং ক্লাসে যাবো। আমার এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি যাকে নিয়ে আজকের এই ঘটনাটি লেখা।

বন্ধুটির নাম রবিউল। ওর সঙ্গেই প্রতিদিন স্কুলে যাই। সে একটু জোকার টাইপের। তার বাড়ি আমাদের গ্রাম থেকে আড়াই-তিন মাইল দূরে পাশের গ্রামে।

মাকে বললাম দুই কাপ চা দিতে।

মা একটু পরেই দুই কাপ চা দিলেন।

চায়ের কাপে আয়েস করে চুমুক দিচ্ছি। আমার দেখাদেখি রবিউলও কাপে বড় একটা চুমুক দিল এবং একটু পরেই সে ও-আ-ক করে সব চা গাল থেকে বের করে দিল।

মনে করলাম, সে ফাজলামি করছে। কিন্তু না।

সত্যিই সে হা করে জিহ্বা বের করে আঃ আঃ করে *পানি পানি* বলে চিৎকার করছে।

পানি দিলাম।

সে একটু পানি খেয়ে রাগত স্বরে বললো, চা এতো গরম হয় তা আমাকে আগে বলবি না।

দেখলাম গরমে তার জিভের ছাল উঠে গিয়েছিল।
পরে আমার বন্ধুটি জানালো, সে জীবনে এই প্রথম চা খেলো।
বর্তমানে আমি একটি এনজিও-তে কর্মরত আছি। তাই যখনই চা খাই তখনই ঘটনাটি মনে পড়ে এবং হাসি পায়।

যশোর থেকে

বিদেশে ম্যাকডোনাল্ডস এবং আরো কিছু ফাস্ট ফুড কম্পানি পরিবেশিত চায়ের কাগজের পেয়ালায় গরম চা বিষয়ে সতর্ক বাণী ছাপা থাকে। – যাযাদি

বানিয়াচংয়ে

– জহির উদ্দিন বাবর

১৯৯৯ সালের কথা। পড়ালেখার জন্য থাকি হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে। সেখানে দীর্ঘ দিন থাকার ফলে বেশ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু মিলেছিল। বন্ধুদের মধ্যে শাহীন ও ফরহাদ ছিল সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। শাহীনের বাড়ি ওই গ্রামেই। ফরহাদের বাড়ি একই জেলার নবীগঞ্জ থানায়। আমরা তিনজন ছিলাম খুবই ঘনিষ্ঠ।
শাহীন আর ফরহাদ ছিল চা পাগল। দিনে কমপক্ষে আট দশ কাপ চা তাদের গলাধঃকরণ হতো। তাদের পাল্লায় পড়ে আমারও ভালোই রপ্ত হয়েছিল।
আমাদের চা খাওয়ার আড্ডা জমতো হোটেল শাপলাতে।
এটি ছিল মূলত ভাত খাবার হোটেল। চা-ও থাকতো। এ জন্য একটু রাত হলে এখানে আর চা পাওয়া যেতো না। তখন যেতে হতো অন্য কোথাও।
আমি আর ফরহাদ থাকতাম হস্টেলে। ঘুমাতে যাওয়ার সময় এক কাপ চা চাই। তা না হলে ফরহাদের চোখে ঘুম আসতো না। হস্টেল সুপারের চোখ ফাকি দিয়ে প্রতিদিনই চা খেয়ে আসতাম। গেটম্যানের সঙ্গে ছিল অন্য সখ্য। তাকে একটি সিগারেট কিংবা একটি পান দিলেই কোনো ঝামেলা হতো না।
এক রাতের ঘটনা। প্রতিদিনের মতো আমরা বাইরে চলে গেছি চা খেতে। হস্টেল সুপার কিভাবে যেন টের পেয়ে যায় আমাদের বাইরে যাওয়ার কথা। নিয়ম-কানুনের তেমন তোয়াক্কা না করাতে তিনি আমাদের প্রতি সব সময়ই ছিলেন বিরূপ। তেমন কিছু বলতেও পারতেন না। কারণ ফরহাদ ছিল পৃন্সিপালের ভাগ্নে। আজ সুযোগ পেয়ে গেলেন। দারোয়ানকে কড়া ভাষায় বলে দেন সে যেন গেট লাগিয়ে ঘুমাতে যায়। কেউ ডাকলেও যেন গেট না খোলে।
দারোয়ান বেচারা চাকরির ভয়ে আদেশ পালনে কোনো কসুর করেনি। সে গেটে তালা ঝুলিয়ে ঘুমাতে চলে যায়। আমরা চা খেয়ে মনের সুখে গল্প করতে করতে আসি। গেটের কাছে এসে প্রতিদিনের মতো নির্ধারিত সংকেত দিই। কিন্তু না, আজ কোনো সাড়া মেলেনি। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও আর দারোয়ানকে জাগাতে পারলাম না।
ফরহাদ ভীষণ ক্ষেপে গেল দারোয়ানের ওপর। দারোয়ানের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়লো।
তাকে বোঝতে চেষ্টা করলাম, এখানে দারোয়ানের কিছু করার নেই। সকল কারসাজি হস্টেল সুপারের। তার সঙ্গে বেশি বাড়াবাড়ি করলে অন্য শিক্ষকদের কানে যাবে। তখন আমাদের অবস্থা হবে বারোটা। এ কথা বলে ফরহাদকে নিয়ে আবার চা স্টলে এলাম।
রাগ উঠলে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এ রাগ উপশম করার কৌশলও আমার জানা আছে। এক কাপ চা হলে তার সেই রাগ সহজেই পানি হয়ে যায়। দুজনে আবার দুকাপ চা খেলাম। বসে ভাবতে থাকলাম

কিভাবে রাতটা কাটানো যায়। কিছুক্ষণ পরেই স্টল বন্ধ করে দেবে। তখন কোথায় যাবো। এ কথা ভাবতে ভাবতে মালিকের তাড়া এলো দোকান বন্ধ করে দেয়ার। অগত্যা আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

শীতের রাত। ভারি কোনো পোশাকও সঙ্গে নেই। এতো রাতে পরিচিত কারো বাড়িতে যাওয়াও সম্ভব নয়। এভাবে আর কোনো উপায় না দেখে দুজনে প্রতিজ্ঞা করলাম, কোথাও যাবো না। হোসেন আলীর পান দোকানের সামনে রাখা চৌকিতে বসে রাত কাটিয়ে দেবো। কিন্তু বাজারে পাহারাদার আবার কি মনে করে কে জানে।

না, কোনো সমস্যা হয়নি। আগে কিছুটা পরিচিতি ছিল। ফরহাদ লোকদেরকে খুব তাড়াতাড়ি কাছের করে নিতে পারে। একটি পান আর একটি সিগারেট দিয়ে পাহারাদারের সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে নিল।

বেচারা পাহারাদার একা সারা রাত কাটায়। আজ সে দুজন সঙ্গী পেয়ে বেশ খুশি। মধ্যবয়সী এই লোক কিছুটা রসিকও। সারা রাত সে তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা ও আমাদের জানা-অজানা নানান কথা বলে বেশ মাতিয়ে রাখলো।

চা খেতে গিয়ে শাস্তি স্বরূপ বাজার পাহারা দেয়ার অভিজ্ঞতাটুকু হলো। মনে মনে অঙ্গীকার করলাম, আর রাতে চা খেতে বের হবো না। কিন্তু ফরহাদের জন্য এই অঙ্গীকার কি আর ঠিক রাখা যায়? এভাবে যতোদিন সেখানে ছিলাম, আমাদের চা খাওয়া চলছিল।

গেন্ডারিয়া, ঢাকা থেকে

উশুর বিশেষ চা

- মোস্তফা খান

উৎসাইয়া মারমা উশু-র সঙ্গে আমার পরিচয় পর্ব ফুল নিয়ে। তখন এরশাদীয় জমানা। ইউনিভার্সিটি এরশাদ ভ্যাকেশনে আক্রান্ত। বড় ভাইয়ের কাছে বেড়াতে গেলাম ফটিকছড়ি। ফটিকছড়ি কলেজের সামনের চাপা গাছ থেকে ফুল পাড়তে গিয়ে উশুর সঙ্গে পরিচিত হই।

একদিনের মধ্যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। উশু মানিকছড়ির ছেলে। এখানে থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে পড়াশোনা করে। ফটিকছড়ি গেলে তাকে নিয়ে ধুরং খালের পাড়ে বেড়াতে যেতাম। সে শহরে এলে যেতাম পতেঙ্গা সি বিচ আর কর্ণফুলি নদীর পাড়ে।

চট্টগ্রাম শহরে রেস্তোরাগুলোতে উশু-কে চা খাওয়াতে জোর করতে হতো। সে বলতো, এ চা খেয়ে তৃপ্তি মেটে না। বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া তার চা খাওয়ার অভ্যাস নেই।

তাদের বিশেষ অনুষ্ঠানের চা খাওয়ানোর জন্য সে চাপাচাপি করে ১৯৯০ সালের প্রথমে আমার ওয়াদা আদায় করে ছাড়ে।

তাকে কথা দিই সামনের ফেব্রুয়ারির পূর্ণিমার সময় আমি তাদের বাড়িতে যাবো।

সে আমাকে মানিকছড়ির *গাড়িটানা* নামক স্থানে আগ বাড়াবে।

উশুকে দেয়া কথা অনুসারে যথানিয়মে তাদের গ্রামে গেলাম। দেখলাম চারদিকে সাজ সাজ রব। পূর্ণিমা উপলক্ষে গানের আসর ও যাত্রা হবে। পরিপূর্ণ আদর-আপ্যায়নের মধ্যে যে চা খাওয়া হলো তার সঙ্গে আমার এতো দিনের খাওয়া চায়ের কিছু তফাত থাকলেও আহামরি কোনো পার্থক্য নেই।

এটা তাকে বলতেই সে জানালো, রাতে আসল চা খাওয়াবে।

রাত নয়টার পর রাতের খাওয়া শেষে উশুসহ গানের আসরে গেলে উশু আমাকে রেখে কোথায় যেন চলে গেল। আমাকে যাদের জিম্মায় রেখে গেল তারা সব টইটুম্বর যুবতী। এরাই উশুর আসল চা কি না তা ভাবতে ভাবতে তাদের সঙ্গে হালকা আড্ডায় মজে গেলাম।

এদিকে গানও শুরু হলো। মারমা ভাষায় গান যা আমার বোধগম্য নয়। তবে সুরটা প্রাণ কাড়ে। গানের সঙ্গে মেয়েদের কোমর আর বক্ষ দোলানো নাচ উপরি পাওনা।

রাত এগারোটার দিকে উশু এসে বললো, দোস্ত, চায়ের সরঞ্জাম জোগাড় হয়েছে চলো।

তার সঙ্গে পূর্ণিমার মায়াবী আলোতে সামনে অগ্রসর হলাম। কিছু দূর এসে দেখলাম পাহাড়ের ঢালে একাকী একটা ঘর। সে ঘরের সামনে যেতেই এক যুবতী সাদর সম্ভাষণ জানালো। মনে মনে ভাবছি কোন চায়ের আয়োজন খোদা জানে!

বসার আমন্ত্রণ পেয়ে বসলাম।

একটু পর যুবতী কাচের গ্লাসে করে চা নিয়ে এলো। কুপির আলোতে মনে হলো লাল শরবত। কিন্তু হাতে ধরতেই বুঝলাম শরবত নয়, গরম চা। চা খেতে গিয়েই এর ভিন্নতা টের পেলাম। উশুকে এর তৈরির প্রণালী জিজ্ঞাসা করতে জানলাম, এ চা তৈরি হয়েছে পানি ছাড়া শুধু খেজুরের রস আর বাগানের কাচা পাতা থেকে।

তাকে গুল গল্প মারছে বলার পর সে জানালো পশ্চিমে যে পাহাড় দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে নেপচুন চা বাগান। সেখান থেকে তারা বিশেষ উৎসব–আয়োজন উপলক্ষে কাচা পাতা আনে। চা বানানোর জন্য খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে যখন রস টগবগ করে ফোটে তখন পরিমাণ মতো চাপাতা দিয়ে সিদ্ধ করা হয়। ওই সময় কয়েকটি এলাচও দেয়া হয় সুগন্ধ পাওয়ার জন্য।

উশুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ চায়ের স্বাদ না হয় অন্য রকম। কিন্তু বিশেষত্ব কি?

সে জানালো, শীতের রাতে এক কাপ চা খেলে শীত কম লাগবে। এটা অনেকটা মধুর মতো। শরীর গরম রাখে। বৃদ্ধরা শীতকালে এ চা খায়। তবে কাচা পাতা পাওয়া না গেলে বাজারের পাতা হলেও চলবে। ভিন্ন স্বাদ ঠিকই পাওয়া যাবে।

প্রায় পনেরো বছর আগে খাওয়া সেই চা আজও আমাকে টানে মানিকছড়ির সে নিভৃত গায়ে যেতে। যদিও যেতে পারিনি। তবে শীতে দুই একবার প্রতি বছরই বাজারের পাতা দিয়ে রসের চা খাই। কিন্তু উশুর সেই চা আর খাওয়া সম্ভব হয়নি।

জানি না আজ উশু কোথায় কেমন আছে।

সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম থেকে

স্ট্র

– কানন

২০০১ সাল। জীবিকার সন্ধানে আমার কর্মস্থল তখন শিল্প নগরী খুলনার খালিশপুরে। যানজট মুক্ত খুলনা শহর ভালোই লাগছিল।

ঈদের ছুটি হয়নি বলে মনটা একটু ভার করেই দুই কলিগ বন্ধু মিলে নিউ মার্কেট গেলাম। উদ্দেশ্য মনটা একটু ভালো করা।

হঠাৎ চোখ পড়ে গেল এক বোরখাওয়ালির চোখে। নিচের ঠোটে ছোট্ট বাকা একটি হাসি দিয়ে বললাম, দোস্ত, দেখ স্বার্থপর কেমন? দুনিয়ার সবাইকে দেখে, নিজেকে দেখতে দেয় না।

কথাটা বোধহয় সরাসরি তাকে আক্রমণ করলো।

পৃথিবীটাই স্বার্থপর। তার উত্তরে বুঝতে পারলাম, কাজ হলেও হতে পারে।

সাহস করে কাছে গিয়ে বললাম, জি ম্যাডাম, আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে আপনার আপত্তি আছে?

মেয়েটি আমাদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো খানিক। জবাব দিল, না, আপত্তি নেই।

দুজনে পরিচয় দিলাম, আমি এইচ এবং বন্ধু আর।

আমি প্রিয়া, বলেই একটা কাগজে বাসার ফোন নাম্বার দিয়ে বিদায় নিল।

দিন চলতে লাগলো। এইচ এবং আর এবং প্রিয়া ক্রমে ক্রমে আরো ঘনিষ্ঠ হতে লাগলাম। দুজনেই সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রিয়াও খুব কৌশলে ডাবলকোলার মতো ডাবল প্রেমিক ভালোভাবে সামাল দিচ্ছিল। কোনোদিন এইচ আবার কোনোদিন আর।

খুলনা শহরে জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক, বিএল কলেজে মোট কথা ভালোই চলছিল।

কিন্তু প্রিয়াকে যতোই বলি, মুখোশ খোলো তোমার চেহারা তো একটিবার দেখতে দেবে।

নানান ছলছুতোয় এড়িয়ে যেতো।

দুজন তো বোকার মতো শুধু চোখ দেখে দেখে প্রেম করে গেলাম। অবশেষে দুই বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোনো প্রকারে তার চেহারা দেখতে হবে।

প্রিয়াকে নিয়ে একদিন বড়বাজার গিয়ে একটা শাড়ি কিনে দিলাম।

গিফট পেয়ে সে তো মহাখুশি।

যাই হোক। তাকে চা খাওয়াবো বলে তাকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টের দোতলায় গিয়ে তিনটি চা-এর অর্ডার দিলাম।

হোটেল বয় চা দিয়ে গেল।

আমরা চা নিচ্ছি।

কিন্তু প্রিয়া চা খাচ্ছে না।

আমাদের মুখ দর্শন আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হতে লাগলো। কিন্তু সে খাবে না।

কিন্তু আমাদের অনড় সিদ্ধান্ত, চা তোমাকে খেতেই হবে।

অবশেষে প্রিয়া হোটেল বয়কে ডেকে একটি পেপসি খাবার স্ট্র চেয়ে তা দিয়ে চা খেতে শুরু করলো।

এইচ এবং আর অবাক হয়ে প্রিয়ার চা খাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখলাম।

কিছুদিনের মধ্যে এইচ চট্টগ্রামে বদলি চলে গেলে আর এবং প্রিয়া আরো ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো।

শুনেছি ওরা বিয়ে করেছে। প্রিয়া হয়েছে মা এবং আর এখন অনেক সুখে আছে।

কাপাসিয়া থেকে